স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

৩য় বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর - জানুয়ারি

২০১৪-২০১৫

সম্পাদক

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী

ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু

ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়

ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক

ডা. জয়ন্ত কুমার দাস

স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে

ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড

হাওড়া-৭১১১০৩

মুখ্য পরিবেশক

বিশাল বুক সেন্টার

৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬

ফোন : ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক

এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় - নিখরচায় সরকারি চিকিৎসা : আশা ও আশঙ্কা ৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **বঙ্গে আর্সেনিক** ৩৯

বাংলায় পানীয় জলে উঠে আসছে আর্সেনিক, মারা পড়ছে গ্রামের মানুষ; অদূর ভবিষ্যতে জল ও খাদ্যে আর্সেনিক বিষণ শহরকেও ছাড়বে না। আর্সেনিক আগে আমাদের দেহে খাদ্য-পানীয়ে মিশে প্রবেশ করত না। কী ঘটে ক্রনিক আর্সেনিক বিষণে? কী ভাবেই বা এটা বাংলার জলে এল? লিখছেন ডা. স্বপন বিশ্বাস

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা** ১৩

মাটির নীচ থেকে তোলা জলে আর্সেনিক আসছে। বিগত শতাব্দীর আটের দশকের শেষাশেষি এই সমস্যা প্রথম ধরা পড়ে। তারপর সমস্যা বহুগণে বেড়েছে, কিন্তু জলকে আর্সেনিকমুক্ত করার ব্যবস্থা হয় নি। নানা জেলার নানা গ্রামে ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে লিখছেন ডা. জয়ন্ত দাস।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **অ্যান্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহার** ১৬

অ্যান্টিবায়োটিক নামে পরিচিত এই গোত্রের ওষুধগুলোতে আগের মতো জীবাণু মরছে না। তার একটা কারণ হল এই সব ওষুধের অতি ব্যবহার আর অপব্যবহার। কী করা যায় আলোচনা করছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **ডায়রিয়ায় একাধিক ওষুধের মিশ্রণ কতটা যৌক্তিক?** ৭

এদেশে ডায়রিয়া খবি হয়, আর ডাক্তারবাবুরা তার জন্য প্রায়শই একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধের মিশ্রণ ব্যবহার করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক আদৌ দরকার নেই, আর একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক তো আরও ক্ষতিকর। লিখছেন ডা. অমিত চক্রবর্তী।

একটি মৃত্যুর ময়নাতদন্ত ২৫

ওঝা-বদ্যির কাছে নয়, সাপ কামড়ালে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু ঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে, সেখানে ওষুধ থাকা সত্ত্বেও বাঁচলেন না এক রোগী। কেন? প্রশ্ন তুললেন বিজ্ঞানকর্মী সৌম্য সেনগুপ্ত

নবজাতকের খাদ্য খাবার (পর্ব-৮) —
কর্তব্যরত মায়েদের সমস্যা ও স্তন্যদুগ্ধের বিকল্প খাবার ২১

মা তাঁর শিশুকে স্তনদান করতে যদি না পারেন? যদি আটকা পড়েন কাজে বা অন্য কোনও অসুবিধায়? কী খাবে সেই শিশু? কেমন করেই বা পুরো পুষ্টি পাবে? উত্তর দিচ্ছেন ডা. স্বপন বিশ্বাস

সোরিয়াসিস ৩৩

এই চর্মরোগ খুব পাওয়া যায় অথচ তার কারণ বা একে সারিয়ে তোলার মতো চিকিৎসা, দুই-ই আজও অধরা। কিন্তু তা বলে কি কিছুই করার নেই? উত্তর দিচ্ছেন ডা. শর্মিষ্ঠা দাস

কেস জন্ডিস ২৮
জন্ডিস, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস 'এ' ভাইরাস সংক্রমণের ফলে হয়, তার কোনও ওষুধ হয় না। অথচ তাই নিয়ে চিকিৎসা ব্যবসার এক 'কেসস্টাডি' করলেন ডা. তুহিন রায়

CPR বা হৃদ-শ্বাস পুনরুজ্জীবন পদ্ধতি: সবার যা জানা দরকার ৯
দুর্ঘটনায় বা আচমকাই হৃদযন্ত্র আর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে কী করবেন? আপনার সামান্য ধারণা আপনার প্রিয়জনকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। 'সিপিআর' পদ্ধতি সরল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ডা. তাপস মণ্ডল

কালের ভালবাসা ৩১
শারীরিক অসুবিধা নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে দুরন্ত লড়াইয়ে জয়! আত্মকথা লিখছেন সায়মদেব মুখার্জি

মূল্যবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষা ৪
বাজারে আগুন দাম, মানুষ কী খেয়ে স্বাস্থ্য ভাল রাখবেন? তার ওপরে আবার বিজ্ঞাপনসর্বস্ব এই যুগে ভাত না খেয়ে লোকে খায় কোকাকোলা। স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় তাই সম্মিলিত প্রতিরোধ, লিখছেন ডা. অভিজিৎ পাল

মনের অসুখ : অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার ৪৯
বারবার হাত ধোয়া কিংবা বারবার ঘরের ছিটকিনি বন্ধ হয়েছে কিনা দেখা। লোকে বলে 'ছুঁচিবাই', 'ছিটেল', কিংবা আরেকটু রূঢ় হয়ে বলে, 'সেয়ানা পাগল'। সত্যিটা কী? লিখছেন ডা. সুমিত দাশ

শব্দ দূষণ ও মনের ওপর তার প্রভাব ৩৬
গান ধরেছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা! প্রবল শব্দের গুঁতোয় কী যে হয়, সুকুমার রায় ভালই বুঝতেন। সে কথাই বিজ্ঞানের ভাষায় বলছেন মনোবিদ রুমঝুম ভট্টাচার্য

চেনা ওষুধ অচেনা কথা : ব্যথার ওষুধ' ২০
অ্যাস্পিরিন নিয়ে লিখছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে : যন্ত্রণা নিয়ে ব্যক্তিগত ৫১
সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। আর ব্যথা হলে মুখ বুজে সহ্য করাটাই রমণীর গুণ। অলীক ধারনার ভারে মেয়েরা মরে যাবার আগেও ভাবে, অকারণ কষ্ট দিলাম না তো? লিখছেন এষা মিত্র

মেয়েদের মূত্রনালীতে সংক্রমণ (ইউ টি আই) ৫৩
ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে মূত্রপথের সংক্রমণ হয়, তবে মেয়েদের হয় বেশি। তার কারণ কিছুটা শারীরিক আর কিছুটা সামাজিক। এই রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা নিয়ে লিখছেন ডা. প্রতাপশঙ্কর দত্ত

ডিসমেনোরিয়া বা মাসিকের সময় ব্যথা ৫৫
অনেক মেয়ের মাসের কয়েকটা দিন যেন দুঃস্বপ্ন! অথচ এ নিয়ে কথা বলতেও বাধো বাধো লাগে, আর ডাক্তাররা বলেন, ওটা স্বাভাবিক, সহ্য কর। কিন্তু ব্যথা তো কমানো যায়— লিখছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ

মেনোপজ ৫৭
মেনোপজ বা চিরকালের মতো ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া। এ নিয়ে চালু ভুল ধারণা অনেক। অথচ স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ নজর রাখা দরকার। আলোচনা করলেন ডা. কাঞ্চন মুখার্জি।

চিঠিপত্র : ৬০

স্বাস্থ্যের বৃত্তে আয়োজিত

স ন্দী প্তা স্মা র ক ব ক্তৃ তা :
স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ও নারীর অধিকার
ব ক্তা : ডা. কাঞ্চন মুখার্জি
ডা. পা র্থ সা র থি গু প্ত স্মা র ক ব ক্তৃ তা :
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আপনার কী পাওয়া উচিত; আপনি কী পাচ্ছেন
ব ক্তা : ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত, ডা. পুণ্যব্রত গুণ

স্থা ন : মহাবোধি সোসাইটি হল, কলেজ স্কোয়ারের পিছনে, কলকাতা
স ম য় : ১০ জানুয়ারি, ২০১৫, বুধবার, বিকাল ৫ টা

সম্পাদকীয়

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সম্প্রতি বলেছেন, সমস্ত সরকারি হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিখরচায় সব রকম চিকিৎসা পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্তরের হাসপাতাল ও রেফার করার হাসপাতাল, ইনডোর ও আউটডোর— জেলা হাসপাতাল স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই রোগীর কোনও রকম পয়সা খরচ করতে হবে না। আই সি ইউ থেকে কেবিন কোথাও বেড চার্জ, ওষুধের দাম, অপারেশন বা ইনভেস্টিগেশনের খরচ দিতে হবে না। ধনী-দরিদ্র, বিপিএল, এপিএল নির্বিশেষে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। কেবল তৃতীয় স্তরের হাসপাতাল, অর্থাৎ মেডিকেল কলেজগুলোতে, আর যে সব ক্ষেত্রে 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল'-এ কাজ করা হচ্ছে, সেখানে 'ইউজার'স ফি' চালু থাকবে।

এটা হলে যে খুব ভাল হয়, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দুশ্চিন্তা, এ সব সত্যিই হবে, না কি আরও পাঁচটা প্রতিশ্রুতির মতো কাগজবন্দি হয়ে থাকবে? কেন না, সরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো নার্স, ডাক্তার, টেকনিশিয়ান ও যাবতীয় স্তরের কর্মীর অভাবে ধুঁকছে, যাঁরা আছেন তাঁদের সকলের কর্মসংস্কৃতি, দায়িত্ববোধ খুব উচ্চমানের, এমন কথাও বলা যাচ্ছে না। এদিকে স্বাস্থ্য দফরের প্রধান সচিব মলয় কুমার দে জানিয়েছেন, বিগত তিন বছরে সরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ১২ হাজার বেড বাড়ানো হয়েছে, সামনের এক বছরে আরও ১৩ হাজার বেড বাড়বে। সত্যি এত বেড বেড়েছে? এত বেড বাড়বে? পাল্লা দিয়ে কর্মী সংখ্যা বাড়ছে কি? কারা চালাচ্ছেন এই বেড, কী ভাবে চলছে এগুলো?

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা, সংক্ষেপে RSBY, নিয়ে আগে আমরা **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র পাতায় আগে আলোচনা করেছি। রাজ্য সরকার মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গের আড়াই কোটি মানুষ RSBY-এর মাধ্যমে বছরে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত টাকা স্বাস্থ্যবীমা খাতে বীমা কোম্পানিগুলোর কাছে পেতে পারেন। সেই টাকাটা সরকারি হাসপাতালে আসা মানুষদের জন্য হাসপাতালগুলো পাবে আর তাতে হাসপাতালগুলোর রোগীর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার দরকার হবে না। বর্তমানেও তো RSBY চালু আছে, সরকারি হাসপাতাল তার থেকে তেমন রোজগার করতে পারছে কি? না কি অতি-চিকিৎসা আর দালাল চক্রের পাকে RSBY-এর টাকাটা এধার-ওধার হয়ে যাচ্ছে? ভবিষ্যতে সেটা আটকানোর কী ব্যবস্থা নিয়েছেন সরকার, তাও বোঝা গেল না।

বিগত কয়েক বছরে 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল' (পিপিপি মেডেল)-এ সরকার ও বেসরকারি সংস্থার এক সঙ্গে কাজ করা বেড়েছে, সরকারি ব্যবস্থা যেখানে ছিল সেখানেও লাভজনক ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে 'ইউজার'স ফি' চালু থাকবে। পিপিপি মডেলে চলা বাড়বে আর নিখরচায় সব রকম চিকিৎসা হবে— এ দু'টো এক সঙ্গে চলবে কেমন করে?

কথাগুলো খানিক নিন্দকের মতো শোনাচ্ছে হয়তো, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে সেটা রক্ষা করার অবস্থা আছে কি না বা অন্যান্য সরকারি পদক্ষেপগুলোর সঙ্গে সেই প্রতিশ্রুতি সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, এটা দেখে নেওয়া আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। এর পরের সংখ্যায় হয়তো আমরা পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আর একটু খুঁটিয়ে দেখব।

❑ এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখাই সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান বিশেষত চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনো পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

With Best Compliment from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.
P-77, KALINDI HOUSING ESTATE
KOLKATA - 700089

মূল্যবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষা

স্বাস্থ্য, খাদ্য, চিকিৎসা—এরা সব একই সুতোয় বাঁধা। তাই আর্থিক ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে স্বাস্থ্য আন্দোলনকে যুক্ত করতে হবে— লিখছেন **ডা. অভিজিৎ পাল।**

আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের ভাল থাকার কোনও রাস্তাই আর খোলা নেই। তার প্রধান কারণ, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। আমরা যতই Balanced diet (ভারসাম্য-যুক্ত পথ্য) নিয়ে আলোচনা করি না কেন, যতই তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করি না কেন, সব মাটি হয়ে যায় যখন দেখি দু'বেলা পেট ভরে খাবারই জোটে না সমাজের ৮০ শতাংশ মানুষের। এই সব মানুষ শুধুমাত্র ভাত, আলুসেদ্ধ খেয়েই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। তাও আবার বছরের কয়েক মাস আলুর দাম, পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। শরীরের জন্য প্রয়োজন আর যা খাদ্য, তারা সে খাদ্য কিনতে পারে না। এগুলো হল শাকসব্জি, ডাল, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি। এই সব খাবার যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয়, তা বেশির ভাগ মানুষের কাছে বিলাসিতা হয়ে গেছে। অথচ আমরা খাদ্য তালিকা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করি ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসি। এই সব মানুষের কাছে Choice of food (খাদ্যের বিচার করা ও প্রয়োজনমতো বাছা) বলতে কিছু নেই। কোনও রকমে ক্ষুধার জ্বালা মেটানো ও বেঁচে থাকাটাই প্রধান। তাও কষ্টকর। বাঁচার কোনও আনন্দ নেই। মানুষের ক্ষুধার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, সে এটার দাস। Freedom from hunger (ক্ষুধার থেকে নিষ্কৃতি) তার কাছে একটা স্বপ্ন মাত্র। তাহলে বিজ্ঞানের এত বিরাট প্রগতি কাদের কাজে লাগলো? এই যে Green Revolution (সবুজ বিপ্লব), White Revolution (শ্বেত বিপ্লব) আর বিজ্ঞানের বিশাল প্রগতি—এটা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কতটা কাজে লাগলো? অথচ যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানের সাধকরা তাদের সাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষের কল্যাণের চেষ্টাই তো করে গেছেন। Dr. Norman Borlaug, Dr. M.S. Swaminathan যে বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের ক্ষুধার সমস্যা মেটাবার চেষ্টা করেছেন, তার কী হলো? না, ক্ষুধা মিটলো না। আর malnutrition (অপুষ্টি)? সে তো ঘরে ঘরে। বিশেষত বাচ্চাদের, কিশোর, কিশোরী, যুবক এবং গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে। গর্ভাবস্থায় অপুষ্টি থাকলে তার প্রভাব সন্তানের ওপর পড়ে, এ তো বহুদিন আগেই প্রমাণিত। এটাও প্রমাণিত যে সেই সন্তান যৌবনে উপনীত হওয়ার পর তার ডায়াবেটিস হতে পারে। আরও কত রকম অসুখ হতে পারে। এদের বলা হয় malrutaition related diseases (অপুষ্টি জনিত অসুখ)। এই যদি সমাজের ৭৫-৮০% মানুষের nutrition status (পুষ্টির অবস্থা) হয় তাহলে সুস্থ থাকবে ক'জন? তাহলে National Health status (জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা) কী দাঁড়াবে? তা হলে আমরা কী করে আশা করি যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা অলিম্পিকে অনেক পদক জিতবে? কী করে আমরা ফুটবলে বিশ্বকাপ খেলব? আসলে গোড়ায় যে গলদ রয়ে গেছে। শুধু পেট ভরে খাবার নয়— সঠিক, স্বাস্থ্যকর, স্বাস্থ্যের ভারসাম্য রক্ষাকারী খাদ্য। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের অভাব নেই আমাদের বাজারে। কিন্তু তা বেশির ভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। তাই পুষ্টিকর খাবার (দুধ, ফল, মাংস) বেশির ভাগ বাচ্চা ও শিশু পায় না। তাই ছোটবেলা থেকেই তারা অপুষ্টির শিকার। বড় হয়ে সমাজকে এরা কী দিতে পারবে?

আমরা যতই Balanced diet (ভারসাম্য-যুক্ত পথ্য) নিয়ে আলোচনা করি না কেন, যতই তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করি না কেন, সব মাটি হয়ে যায় যখন দেখি দু'বেলা পেট ভরে খাবারই জোটে না সমাজের ৮০ শতাংশ মানুষের।

সঠিক খাদ্য না পেয়ে ৩০-৪০ বছর বয়স থেকেই নানান অসুখের শিকার হতে শুরু করে এই মানুষরা। এদের কর্মক্ষমতাও অল্প বয়সেই কমতে থাকে। আবার চিকিৎসা করাতে গেলেও কী অব্যবস্থা, তাও আমাদের কাছে অজানা নয়। এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ওষুধের দামও অনেক। ওষুধ কেনা, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। অথচ Pharmaceutical revolution (ওষুধের বিপ্লব)-ও তো হয়েছে। গত ২৫ বছরে কত না ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। কাদের জন্য? মুনাফার বহর দেখলে মনে হয় যে বিজ্ঞান কি সাধারণ মানুষের জন্য নয়, শুধু একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য?

এবার দেখা যাক তাদের স্বাস্থ্য-যারা ভাগ্যবান ২০-২৫%-এর মধ্যে পড়ে। এদের তো সেরকম অর্থাভাব নেই যে এরা পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত বা প্রয়োজনে চিকিৎসা করানোয় অপারগ। তা হলে এদের মধ্যেও সুস্বাস্থ্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না কেন? একটা কারণ হল প্রাচুর্য্য। যেহেতু এদের অর্থাভাব নেই, সেহেতু এরা অনেক সময়ই খাদ্যের ব্যাপারে বদ অভ্যাস রপ্ত করে। যেমন ফাস্ট ফুড বেশি পরিমাণে খাওয়া, অতিরিক্ত তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া, মাত্রাতিরিক্ত মশলা খাওয়া, ক্ষতিকারক নেশা করা ইত্যাদি। বেশি ক্যালরিযুক্ত খাদ্য খেলেই হয় না— সেই অতিরিক্ত ক্যালরিকে শরীরের কায়িক পরিশ্রম দ্বারা ব্যয় করাটাও প্রয়োজন। তাই এদের মধ্যে Life style diseases (জীবনশৈলী জনিত অসুখ)-এর প্রবণতা বেশি। শরীরের ওজন বেশি হয়, অতিরিক্ত চর্বি জমতে থাকে। এটাকে বলা হয় স্থূলতা (obesity)। এটাই এখন সমাজের ২০-২৫% মানুষের কাছে বিভীষিকার রূপ নিচ্ছে। পয়সার প্রাচুর্য আছে বলেই সব সময় এই সব হাই ক্যালরি খাবার (মুখরোচক তো বটেই) খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। এদের শিক্ষা-দীক্ষার অভাব নেই,

আমরা কী করে আশা করি যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা অলিম্পিকে অনেক পদক জিতবে?

কিন্তু জীবনের প্রতি সঠিক মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠার শিক্ষা থেকে এরা বঞ্চিত। ধনতান্ত্রিক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই যে ত্রুটি, এটাই সর্বনাশের মূল। অথচ ভেবে দেখুন তো যাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল, পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে, ভাল খাবার মন্দ খাবার কী তা জানে, তারা কেন স্বাস্থ্যকর খাদ্য খাবে না। এরা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছে।

এদের শিক্ষা-দীক্ষার অভাব নেই, কিন্তু জীবনের প্রতি সঠিক মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠার শিক্ষা থেকে এরা বঞ্চিত।

আমরা ডাক্তাররা বেশির ভাগ এই শ্রেণিতেই পড়ি। এবং দুঃখের কথা যে আমরা অপরকে যা শেখাতে চাই, অনেক সময়ই আমরা নিজেদের জীবনে তা পালন করি না। সুতরাং আমাদের যেটা পালন করা উচিত তা হল—

১। স্বল্পাহার, কিন্তু স্বাস্থ্যকর আহার

২। সময় মতো আহার

৩। প্রতিদিন কায়িক শ্রম (হাঁটা)

৪। নেশা থেকে দূরে থাকা

৫। বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবার কদাচিৎ। প্রত্যহ তো নয়ই।

এর সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন —

১। ৭ থেকে ৮ ঘন্টা বিশ্রাম ও ঘুম।

২। আনন্দে থাকা। মানুষের বিপদে সাহায্য করা। সমাজের কল্যাণে কাজ করা।

অনেক তো আলোচনা হল, কিন্তু কী করতে হবে? আমার কয়েকটা প্রস্তাব আছে—

১। যারা সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ও অর্থাভাবে জর্জরিত, তাদের কাছে কম খরচে স্বাস্থ্যকর খাবার কী হতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা করা। এই কাজটা ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সবাই করতে পারবে। ব্যাপকভাবে এর প্রচার দরকার।

২। খাদ্য ও ওষুধ (চিকিৎসা) দুটো জীবনে প্রয়োজনের তালিকায় মোটামুটি একই জায়গা পড়ে। তাই খাদ্য আন্দোলন, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও স্বাস্থ্য আন্দোলন একই সঙ্গে করতে হবে। সাধারণ মানুষকে নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনকে জোরদার করতে বাম-গণতান্ত্রিক ব্যাপক ঐক্য দরকার। এরকম আন্দোলন তো আগে হয়েছে। আবার হবে না কেন?

৩। আমরা যারা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ইত্যাদি তাদের নিজেদের খাদ্যাভ্যাস পাল্টাতে হবে। আমাদের জীবনশৈলী (Life style) পাল্টে অন্যদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, নেতৃত্ব দিতে গেলে আগে নিজেদের জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে।

লেখক পরিচিতি : ডা. অভিজিত পাল, এমবিবিএস, এমডি, ডিটিএম অ্যান্ড এইচ, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন; যুক্ত আছেন হাওড়ার শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে ওঠা একটা ক্লিনিকেও।

With Best compliments from

Alteus Biogenics Pvt. Ltd.

Regd. Office : 18/61B Dover Lane, Kolkata - 700 029

Phone : 033 2486-7885 / 8087

Head Office : 14-B, Dover Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 029

ডায়রিয়া সারাতে একাধিক ওষুধের মিশ্রণ

কতটা যৌক্তিক?

অন্যান্য অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো ভারতের অধিবাসীরা প্রায়শই ভোগেন অ্যামিবিয়াসিস, জিয়ারডিয়াসিস ও অন্যান্য জীবাণুঘটিত ডায়রিয়াতে। কারণ যথাযথ মল-নিকাশি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও দূষিত পানীয় জল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ডায়রিয়াগুলো আপনা থেকেই সেরে যায়, গুরুত্বপূর্ণ হল শরীরে জল ও লবণের ঘাটতিকে পূরণ করা। যদি জীবাণুনাশক দিতেই হয় তাহলে কোন জীবাণু থেকে ডায়রিয়া হয়েছে দেখে দেওয়াটাই উচিত। একই সঙ্গে এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা বা জিয়ারডিয়ার মতো কোনও পরজীবী এবং কোনও ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসের কারণে ডায়রিয়া হয়েছে এমনটা দেখা যায় না বললেই চলে। তাই ডায়রিয়ায় পরজীবী মারার ওষুধ ও জীবাণুনাশকের মিশ্রণ দেওয়াটা কেবল অযৌক্তিকই নয়, ক্ষতিকরও — লিখছেন ওষুধ বিজ্ঞানী **ডা. অমিত চক্রবর্তী।**

ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন হলো একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ। সাধারণ ভাবে ওষুধবিজ্ঞান ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশনকে অযৌক্তিক বলে মনে করে, কেন না এতে একটা ওষুধের মাত্রা ঠিক রেখে অন্যটার মাত্রা কমানো-বাড়ানো যায় না, সাধারণ ভাবে ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশনের দাম উপাদানগুলোর মোট দামের চেয়ে বেশি হয়, এক একটা ওষুধ শরীরে কাজ করে এক এক ভাবে এক এক রকম সময়ে ধরে, ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় উপাদানগুলোর মোট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি, ইত্যাদি।

১৯৯৫-১৯৯৬ নাগাদ ভারতের ওষুধ বাজারে ডায়রিয়ার ব্যবহার করার জন্য ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন আসে— সিপ্রোফ্লক্সাসিনের সঙ্গে টিনিডাজোলের মিশ্রণ, নরফ্লক্সাসিনের সঙ্গে টিনিডাজোলের মিশ্রণ ...। ওষুধ কোম্পানিগুলোর বক্তব্য ছিল — উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রোগীদের নাকি পরজীবী ও ব্যাকটিরিয়ায় মিশ্র সংক্রমণ থাকে, তাই এ ধরনের ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

যদিও এই বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই তবু ডাক্তাররা উত্তরোত্তর সংখ্যায় এই ধরনের ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন ব্যবহার করতে থাকেন।

C-Marc নামের একটা মার্কেট রিসার্চ গ্রুপ ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে ১৯৯৮-এর নভেম্বর থেকে ১৯৯৯-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে। মার্কেট রিসার্চ গ্রুপটার সদর দফতর কলকাতা-স্থিত হলেও প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করা হয়েছিল সারা ভারত থেকে। বিভিন্ন বিষয়ের যে সব ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করা হয়, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম মেডিসিনে এমডি। এঁরা সবাই প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করেন এবং প্রেসক্রিপশনগুলো আউটডোরে লেখা।

> সাধারণ ভাবে ওষুধবিজ্ঞান ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশনকে অযৌক্তিক বলে মনে করে

ডায়রিয়া চিকিৎসার ২১৬৩টা প্রেসক্রিপশন মূল্যায়নের জন্য নেওয়া হয়। এই প্রেসক্রিপশনগুলোতে জীবাণু মারার ওষুধ লেখা হয়েছিল। যে সব ওষুধে কেবল ব্যাকটিরিয়া মারার ওষুধ লেখা হয়েছিল সেগুলো অডিট থেকে বাদ দেওয়া হয়। কিছু প্রেসক্রিপশনে ওষুধ লেখার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল, কিছুতে করা হয় নি।

অডিটে কী দেখা গেল?

দেখা গেল যে ৫৯% প্রেসক্রিপশনে ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন লেখা হয়েছে—

- ৩৩% সিপ্রোফ্লক্সাসিন ও টিনিডাজোলের ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন
- ২৬% নরফ্লক্সাসিন ও টিনিজাডোলের ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন

৪১% প্রেসক্রিপশনে একটা করে পরজীবী মারার ওষুধ ছিল—

- ১৪% মেট্রোনিডাজোল
- ১৪% সেকনিডাজোল
- ১৩% টিনিডাজোল

দ্বিতীয়ত যে বিষয়টা নজরে আসে তা হলো—সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন সিপ্রোফ্লক্সাসিন ও টিনিডাজোলের ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন সব চেয়ে দামিও বটে। সেই সময়কার দামের হিসেবে ৫ দিনের কোর্স মোটামুটি ৯৮ টাকা। এর পরে ব্যবহৃত ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন নরফ্লক্সাসিন ও টিনিডাজোলের ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশনের খরচ দু'নম্বর স্থানে, ৫ দিনে খরচ ৬৭ টাকা। একটা করে পরজীবী মারার ওষুধের কোর্সের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বেশি ব্যবহৃত ওষুধের কোর্সের খরচ বেশি— মেট্রোনিডাজোল ৩৫ টাকা, সেকনিডাজোল ২৬টাকা,

টিনিডাজোল ২০ টাকা।

এই তথ্যগুলো প্রায় ১৬ বছর আগেকার, কেউ বলতেই পারেন— এই সময়ে প্রেসক্রিপশনের গতি-প্রকৃতি পালটে গেছে। সম্ভাবনা কম। কেন না, এর মধ্যে উদয় হয়েছে সিপ্রোফ্লক্সাসিনের সঙ্গে মেট্রোনিডাজোলের মিশ্রণ, নরফ্লক্সাসিনের সঙ্গে মেট্রোনিডাজোলের মিশ্রণ, ওফ্লক্সাসিনের সঙ্গে অরনিডাজোলের মিশ্রণ, ইত্যাদির। আর ডাক্তাররাও নির্বিবাদে সেগুলো রোগীদের দিয়ে চলেছেন।

ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার হল : বেশি দামের ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশনের বদলে কম দামের একটা ওষুধ ব্যবহার করা। এই অডিট বলছে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ডাক্তার ডায়রিয়া চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করেন না।

> রোগীদের তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার **মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা** মেটায় ডায়রিয়ার ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন।

এই অডিটে সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে যে ডাক্তাররা কাজ করেন তাঁদের প্রেসক্রিপশন নেওয়া হয়নি। বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন পেলে বোঝা যেত, যে সব রোগীর পয়সা দেওয়ার ক্ষমতা বেশি তাঁদের ক্ষেত্রে ডাক্তাররা কী ওষুধ দেন।

আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ— যথাযথ চিকিৎসা না করার কারণে রোগীদের বেশি পয়সা খরচ করতে হচ্ছে। যুক্তিসঙ্গত ভাবে চিকিৎসা করতে গেলে ওষুধ দেওয়ার আগে মল পরীক্ষা করে রোগজীবাণুটাকে চিনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়, তা হলে সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য একটা ওষুধ দিলেই রোগ সারে। যত রকমের রোগ জীবাণু থেকে ডায়রিয়া হতে পারে সবগুলোর জন্য একটা করে ওষুধ নিয়ে ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশনে কিন্তু রোগ সারার নিশ্চয়তা নেই।

তাহলে ডাক্তাররা ডায়রিয়া সারাতে ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন দেন কেন?

- নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন মানুষের কাছে ডায়রিয়া থেকে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা মানে কাজে ফিরতে পারা— অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে বাঁচা। পানীয় জলের অপ্রতুলতা, খাদ্যে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা, অপর্যাপ্ত মল নিকাশী ব্যবস্থার কারণে ডায়রিয়ার মতো রোগ তাঁদের লেগেই থাকে। মল পরীক্ষার জন্য এক দিন বেশি সময় লাগে। রোগীদের তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার **মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা** মেটায় ডায়রিয়ার ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন।
- ডায়রিয়ার যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসার জন্য অন্তত দু'বার ডাক্তারের কাছে যেতে হয়— একবার মল পরীক্ষার আগে, দ্বিতীয় বার মল - পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে। মল পরীক্ষার খরচ এবং একটা ওষুধের কোর্সের খরচ মিলিয়ে যদিও ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশনের চেয়ে কম, তবু রোগী কাজে যেতে না পারার জন্য যুক্তিসঙ্গত তাঁর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় বেশি।
- ডায়রিয়ার ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন ব্যবহারে আপাত দৃষ্টিতে আর্থিক লাভ মনে হলেও আসলে আর্থিক ক্ষতিই হয়। ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশনে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ঝুঁকি বেশি, রোগজীবাণুর নরফ্লক্সাসিন ও সিপ্রোফ্লক্সাসিন - প্রতিরোধী হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।

রোগজীবাণুর ওষুধ-প্রতিরোধী হওয়া :

নরফ্লক্সাসিন ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত ডায়রিয়া এবং মূত্রতন্ত্রের জীবাণু সংক্রমণের মহৌষধ ছিল। ডায়ারিয়ার মতো রোগে ক্লোরামফেনিকলের ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন ব্যবহারের ফলে টাইফয়েড জীবাণু যখন ক্লোরামফেনিকল-প্রতিরোধী হয়ে গেল তখন টাইফয়েড জীবাণুকে মারার মহৌষধ ছিল সিপ্রোফ্লক্সাসিন। এখন অধিকাংশ মূত্রতন্ত্রের জীবাণু সংক্রমণের মূত্রের কালচার- সেন্সিটিভিটি পরীক্ষা করলে জীবাণু নরফ্লক্সাসিন ও সিপ্রোফ্লক্সাসিন প্রতিরোধী পাওয়া যায়। টাইফয়েড জ্বরেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিপ্রোফ্লক্সাসিন কাজ করে না।

রোগীর তথাকথিত আর্থিক ক্ষতি বাঁচাতে গিয়ে ডাক্তাররা মানব সমাজকে কোন দিকে ঠেলে দিচ্ছেন?

স ম্পা দ কী য় সং যো জ ন : ডায়রিয়া হলে কী করবেন?

ডায়রিয়ার মূল বিপদ, পাতলা পায়খানা এবং কখনও কখনও বমির ফলে শরীর থেকে জল ও লবণ বেরিয়ে যাওয়ায় লবণ-জলের অভাব (dehydration) থেকে। লবণ-জলের অভাব হতে দেবেন না, হয়ে থাকলে পূরণ করুন।

- প্রচুর জল, নুন-চিনির শরবৎ, ভাতের মাড় ইত্যাদি খেতে থাকুন।
- নুন-চিনির শরবৎ বানাতে এক গেলাস (২৫০ মি.লি) পরিষ্কার জল নিন। তাতে তিন আঙুলের এক চিমটি নুন ও কানা বরাবর ভর্তি দুই চায়ের চামচ চিনি মেশান। লেবু থাকলে অর্ধেকটা লেবুর রস দিন।
- চিনি মেশানোর আগে নুন জলে মিশিয়ে চেখে নিন, তা যেন চোখের জলের চেয়ে বেশি নোনতা না হয়।
- আগেই লবণ-জলের অভাব হয়ে গিয়ে থাকলে অল্প-অল্প করে শরবৎ খেতে থাকুন যতক্ষণ না পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার প্রস্রাব হচ্ছে।
- তাছাড়া একেক বার পায়খানা হলে বাচ্চাদের আধ গেলাস থেকে এক গেলাস আর বড়দের এক গেলাস থেকে দুই গেলাস শরবৎ খাওয়ান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডায়রিয়া আপনা থেকে সেরে যায়, ওষুধ লাগে না।
- ৭০-৮০% ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার কারণ ভাইরাস, তার বিরুদ্ধে ব্যাকটিরিয়ানাশক বা পরজীবীনাশক ওষুধ কাজ করে না।
- ১-২% ক্ষেত্রে হঠাৎ করে হওয়া ডায়রিয়ার কারণ এমিবিয়াসিস বা জিয়ার্ডিয়াসিস, সেগুলোও সাধারণত আপনা থেকেই সেরে যায়।
- বাকি ক্ষেত্রে ডায়রিয়া হয় ব্যাকটিরিয়া থেকে। ব্যাকটিরিয়াঘটিত ডায়রিয়ার বেশির ভাগও আপনা থেকে সারে। জীবাণুনাশক দিতেই হয় রক্ত-আমাশা হলে। সে সব ক্ষেত্রে নরফ্লক্সাসিন বা সিপ্রোফ্লক্সাসিন প্রথম পছন্দের ওষুধ।

মূল লেখা : *ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিকেল এথিকস্* চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭-এ প্রকাশিত।

লেখক পরিচিতি : ডা. অমিত চক্রবর্তী, এমবিবিএস, এমডি, ওষুধ বিজ্ঞানী।

CPR বা হৃদশ্বাস পুনরুজ্জীবন পদ্ধতি

সবার যা জানা দরকার

যাঁর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অর্থাৎ হঠাৎ করে হার্টের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস চালিয়ে তাঁর মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতি হল Cardio-Pulmonary Resuscitation বা CPR। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় হাসপাতালের বাইরে— পথে-ঘাটে বা ঘরে। তাই কেবল ডাক্তার বা চিকিৎসাকর্মী নন, সিপিআর জানা উচিত প্রত্যেক নাগরিকের। আর এখন মুখ থেকে মুখে শ্বাস দেওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে হার্টে চাপ দিয়ে তা চালু রাখার ওপর— লিখছেন **ডা. তাপস মণ্ডল।**

আমেরিকায় হাসপাতালের বাইরে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় বছরে ৩ লাখ ৮৩ হাজার মানুষের, যা কিনা মোট কার্ডিয়াকে অ্যারেস্টের ৮৮%। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই আগে সুস্থ ছিলেন, হার্টের অসুখ আছে বলে জানা ছিল না বা অন্য কোনও ঝুঁকির কারণও ছিল না।

মিনিটে ৬০ থেকে ১২০ বার হৃৎস্পন্দন হওয়া স্বাভাবিক, স্বাভাবিক ছন্দ থেকে বিচ্যুতিকে বলে এরিদমিয়া। এরিদমিয়া শুরু হয় অলিন্দে বা নিলয়ে, যা থেকে হঠাৎ করে হার্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন হল এক ধরনের এরিদমিয়া, যাতে নিলয়ের মাংসপেশী অনিয়মিত ছন্দে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হতে থাকে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে এ থেকেও। কী হচ্ছে বোঝার জন্য ইসিজি লাগে। যে কারণেই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হোক না কেন, সিপিআর সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

শ্বাসপথে অবরোধ, বুকে চাপ দেওয়া ও বাতাস দেওয়ার মধ্যে লম্বা ছেদ, পাকস্থলিতে বাতাস ঢোকা—ইত্যাদি কারণে ফুসফুসে বাতাস জোগানোর কাজ ঠিক-ঠাক হয় না অনেক সময়। এ সব ক্ষেত্রে বুকে চাপ দেওয়াই অনেক সময় কাজের

সিপিআর-এর উদ্দেশ্য

যে সময়ে নিলয়ের অনিয়মিত স্পন্দনে নিলয় থেকে রক্ত ঠিক মতো বেরোতে পারছে না, সে সময়ে কৃত্রিম ভাবে হার্টে মালিশ করে মস্তিষ্ক ও হার্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গগুলোতে রক্ত-সরবরাহ বজায় রাখাই হল সিপিআর-এর উদ্দেশ্য। সিপিআর চালাতে চালাতে কখনও-কখনও হৃৎপিণ্ড আবার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পায়। অন্যরা তা ফিরে না পেলেও দক্ষ চিকিৎসাকর্মী এসে পৌঁছানো অবধি হার্ট থেকে রক্ত সরবরাহ বজায় রাখা যায় সিপিআর চালিয়ে।

সিপিআর-এর দুই ধরন

১। একই সঙ্গে হার্টে চাপ দেওয়া আর ফুসফুসে বাতাস জোগানো।
২। কেবল হার্টে চাপ দিতে থাকা।

প্রথম ক্ষেত্রে ৩০০ : ২ অনুপাতে হার্টে চাপ দেওয়া এবং ফুসফুসে বাতাস জোগানোর কাজ চালাতে হয়। হার্টে চাপ দেওয়া উচিত মিনিটে ১০০ বার করে। দু'টোই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দেখা যায়—শ্বাসপথে অবরোধ, বুকে চাপ দেওয়া ও বাতাস দেওয়ার মধ্যে লম্বা ছেদ, পাকস্থলিতে বাতাস ঢোকা—ইত্যাদি কারণে ফুসফুসে বাতাস জোগানোর কাজ ঠিক-ঠাক হয় না অনেক সময়। এ সব ক্ষেত্রে বুকে চাপ দেওয়াই অনেক সময় কাজের।

সাম্প্রতিক কালে আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশন বলছে যে কেবল বুকে চাপ দিয়ে CPR প্রথাগত CPR-এর মতোই কাজের। হার্ট বন্ধ হয়ে গেলে বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে চালু করা হয় যে যন্ত্রে তার নাম অটোমেটিক এক্সটারনাল ডিফিব্রিলেটর। যখন এই যন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না তখন হার্টে চাপ দিয়েই প্রথম কিছু মিনিট গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোতে রক্ত চলাচল চালু রাখা যায়।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—বুকে চাপ দিয়ে CPR অনেক মানুষই সহজে করতে পারেন।

দেখা যায় হাসপাতালের বাইরে হার্ট বন্ধ হলে মাত্র ৬-৮% মানুষ বাঁচেন। সে ক্ষেত্রে যাঁরা আশেপাশে আছেন তাঁরা যদি CPR দেন তা হলে প্রায় ২৩% মানুষকে বাঁচানো যায়।

হার্ট বন্ধ হওয়ার পরের প্রথম মিনিটগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, CPR শুরু করতে যত দেরি হবে, রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা তত কমবে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের পর অনেক ক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন অর্থাৎ নিলয়ের অনিয়মিত কম্পন হতে থাকে। এমনটা হলে প্রতি মিনিট দেরির জন্য বাঁচার সম্ভাবনা ৭-১০% করে কমে। ১৫ মিনিট পেরিয়ে গেলে বাঁচার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে।

কেন সবার CPR জানা দরকার?

যে সব দেশে মানুষের CPR সম্বন্ধে ধারণা আছে, সেখানকার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়—

- যে সব ক্ষেত্রে বুকে চাপ দিয়ে CPR করা হয়েছে তাদের ৩৩% ক্ষেত্রে চাপ ঠিকমতো দেওয়া হয়নি।
- কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করা হয়েছে মাত্র ৪৮% ক্ষেত্রে।

সে সব দেশে বুকে চাপ দিয়ে CPR সম্পর্কে সচেতনতা বাড়লে মৃত্যুর হার কিছুটা কমবে।

কিন্তু আমাদের দেশের মতো দেশে, যেখানে CPR সম্পর্কে কম মানুষই জানেন, সেখানে বুকে চাপ দিয়ে CPR সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ালে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের পর মৃত্যুর হার অনেকটাই কমবে।

সময়ের বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ :

দেখা যায় হার্ট বন্ধ হওয়ার পর ৪ মিনিট পেরিয়ে গেলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যায়। সে সময় যাঁরা কাছাকাছি আছেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বুকে চাপ দিয়ে CPR শুরু করলে বাঁচার সম্ভাবনা ২-৩ গুণ বেড়ে যায়। বুকে চাপ দিয়ে CPR করলে সাহায্যকারীর কোনও রকম ক্ষতি হয় না।

কতক্ষণ CPR করবেন? আদর্শ হলো ৮ থেকে ১২ মিনিট বুকে চাপ দিয়ে CPR করা যতক্ষণ না ডিফিব্রিলেটরের প্রয়োগ হচ্ছে। যেখানে তার ব্যবস্থা নেই সেখানে বেশি সময় CPR চালিয়ে বেশ কিছু জীবন বাঁচানো যায়।

CPR নিয়ে কিছু ভুল ধারণা :

- অনেকে ভাবেন যিনি CPR করবেন, তাঁর ক্ষতি হবে। এ ধারণা যে ভুল তা আগেই বলেছি।
- অনেকের ধারণা ঠিকভাবে CPR করতে না পারলে রোগীর ক্ষতি হয়। গবেষণায় দেখা গেছে CPR- এর পদ্ধতি ভুল হলেও রোগীর কোনও ক্ষতি হয় না। বরং লাভ হলেও হতে পারে।
- অনেকে ঠিকমতো মুখ থেকে মুখে বাতাস দিতে পারেন না, অনেকের অন্যের মুখে মুখ ছোঁয়াতে সংকোচ থাকে। এ সব ক্ষেত্রে সমস্যা কাটে কেবল বুকে চাপ দিয়ে CPR করলে।

CPR শেখার পথে কিছু সংস্কৃতিগত বাধা

- অনেক সমাজে মহিলারা কোনও পুরুষ তাঁদের মুখে মুখ ছোঁয়াবে, বুকে চাপ দেবে এমনটা ভাবতেই অস্বস্তিবোধ করেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে CPR কর্মশালা করে এমন বাধা কাটানো যাবে।
- অনেকে আবার ভাবেন— চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মী নন এমন একজন মানুষ CPR করতে গিয়ে কোনও ক্ষতি না হয়ে যায়। আগেই বলেছি পদ্ধতিতে কিছু ভুল হলেও CPR থেকে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর হার্ট বন্ধ হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হাসপাতালের বাইরে, সেখানে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী থাকবেন না, অন্যরাও ভাল ভাবে CPR করতে পারেন যদি তাঁদের শেখানো হয়— এই বিষয়টাও প্রচারে নিয়ে যেতে হবে।

কিভাবে CPR শিখবেন?

ছোট্ট একটা ভিডিও দেখে আপনারা CPR শিখতে পারেন। অনুশীলন করতে পারেন ম্যানিকুইন অর্থাৎ প্রমাণ সাইজের মানুষ পুতুলের ওপর (যদি পান)। আমরা এমন একটা ভিডিও করেছি বিভিন্ন ভাষায়। বাংলা ভিডিওটা ব্যবহার করে কর্মশালা করেছি কলকাতা এবং হাওড়া, বর্ধমান ও উত্তর ২৪ পরগণার কিছু জায়গায়। ফলাফল আশাপ্রদ। আপনারাও আসুন না—যদি CPR দিয়ে কিছু প্রাণ বাঁচানো যায়।

প্রথাগত CPR

হঠাৎ করে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেছেন, তখন কী করবেন?

বুকে কান পেতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করুন। শ্বাসনালিকে খোলা রাখার জন্য মাথাটা যতটা পারা যায় পেছন দিকে ঠেলে দিন। আপনার মুখ রোগীর নাক-মুখের থেকে ২-৩ আঙুল দূরে রাখুন যাতে রোগীর নিঃশ্বাস আপনার মুখে পড়লে আপনি বুঝতে পারেন। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সে ভাবে মুখ রাখলে নিঃশ্বাসের আওয়াজও শুনতে পাবেন, বুকের ওঠানামাও দেখতে পারবেন।

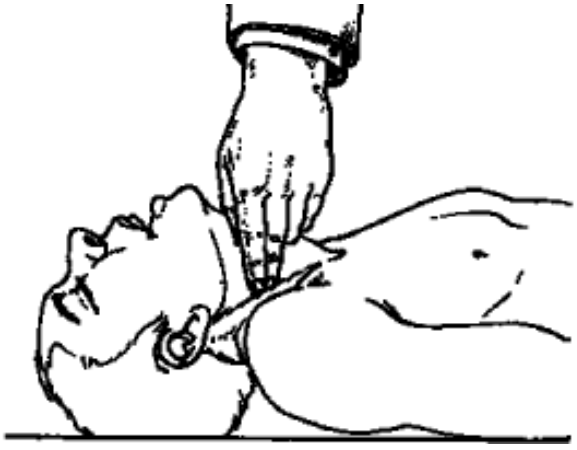

ক্যারোটিড ধমনিতে নাড়ি দেখুন—হার্ট চলছে কি না। শ্বাসনালি ও গলার পাশের বড় মাংসপেশির মধ্যেকার খাঁজে দুই আঙুলের ডগা দিয়ে ক্যারোটিড নাড়ি অনুভব করতে পারা যায়।

শ্বাস চললে ও নাড়ি পাওয়া গেলে রোগীকে নিচের ছবির মতো শোয়ান।

রোগীকে উপুড় করে মাথা এক পাশে ঘুরিয়ে রাখুন। যে দিকে রোগীর মুখ ঘোরানো সেদিকের হাত ও পা এবং থুতনি টেনে ওপর দিকে তুলুন। অন্য দিকের হাত ও পা সোজা থাকবে। এই অবস্থানকে বলা হয় Recovery Position।

- শ্বাস চলছে কিন্তু নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না
- নাড়ি চলছে কিন্তু শ্বাস বন্ধ
- শ্বাসও চলছে না, নাড়িও পওয়া যাচ্ছে না

—এই তিন ক্ষেত্রে শুরু করুন CPR অর্থাৎ হৃৎশ্বাস পুনরুজ্জীবন পদ্ধতি।

CPR এর ABC

শ্বাসপথ (Airway)-কে অবরোধমুক্ত করুন

শ্বাস (Breathing) চালান।

রক্ত চলাচল (Circulation) চালান।

A শ্বাসপথকে খোলা রাখতে শক্ত জায়গায় রোগীকে চিৎ করে শোয়ান। রোগীর ঘাড়ের নীচে নিজের এক হাত দিন, অন্য হাত তাঁর কপালে রাখুন। ঘাড়ের নীচের হাতটা তুলুন, অন্য হাত দিয়ে কপালে চাপ দিন যাতে মাথা পেছন দিকে বেঁকে যায়।

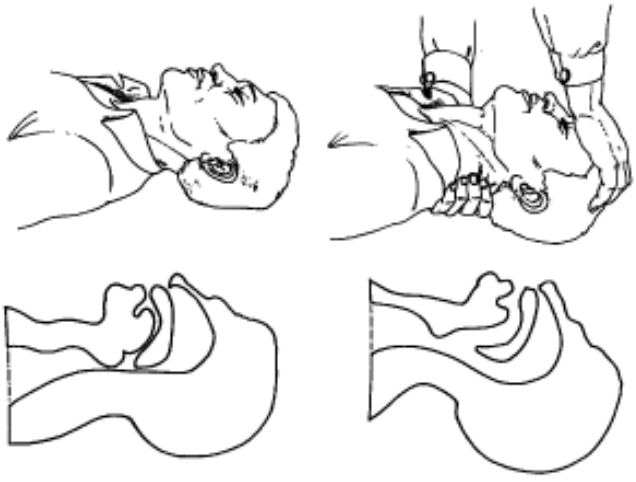

ছবিতে যেমন দেখছেন এমনটা করলে সে ভাবে শ্বাসপথ খুলে যায়। যদি শ্বাসপথ না খোলে তা হলে দ্রুত একটা আঙুল দিয়ে মুখে বা গলায় কিছু আটকে থাকলে বার করে দিন।

B শ্বাসপথ পরিষ্কার হওয়ার পরও যদি শ্বাস শুরু না হয় তা হলে আপনাকে রোগীর মুখে বা নাকে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে হবে।

দুই আঙুলে রোগীর নাক টিপে ধরে নিজের মুখ দিয়ে রোগীর মুখের চারদিকে চেপে ধরুন। প্রথমে চারবার দ্রুত পুরোপুরি শ্বাস ফুঁ দিন।

এবার নিজের মুখ সরিয়ে রোগীকে আপনা থেকে নিঃশ্বাস ছাড়তে দিন। মিনিটে ১০-১২ বার এরকম করতে হবে।

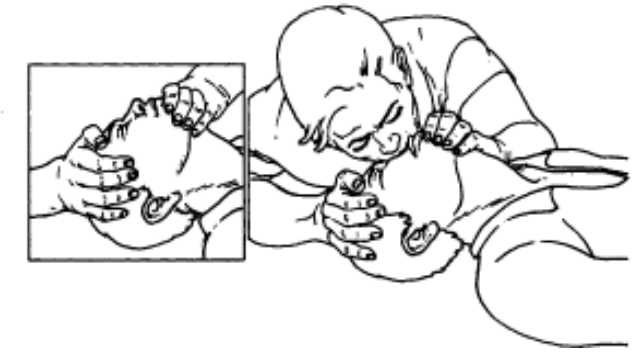

যখন কোনও কারণে মুখ খোলা যাচ্ছে না বা মুখে আঘাত আছে তখন রোগীর মুখ বন্ধ রেখে তাঁর নাকের চারদিকে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে ফুঁ দিন।

C রক্ত-চলাচল বজায় রাখার জন্য বা হার্ট চালু রাখার জন্য বুকে চাপ দিতে হবে।

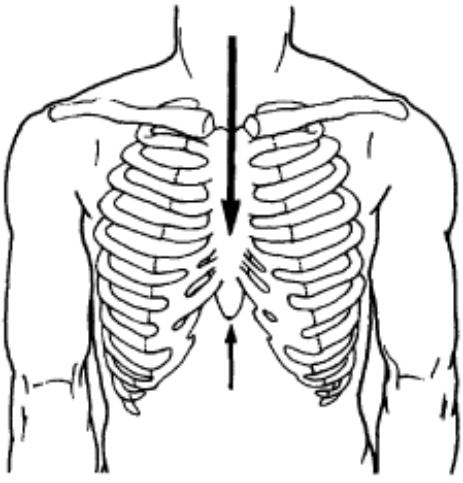

বুকের সামনে মাঝখানের চ্যাপটা হাড় স্টারনামে চাপ দিলে হার্টে চাপ পড়ে। হৃৎপিন্ডে ঠিকমতো চাপ দিতে গেলে রোগীর স্টারনামের নিচের অংশকে চেপে প্রায় ৪ থেকে ৫

সে.মি. (২ ইঞ্চি) নামাতে হয়।

রোগীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসুন। এক হাতের তালুর কব্জির কাছের অংশ স্টারনামের নিচের অর্ধে থাকবে। হাত যেন স্টারনামের নিচের সূঁচালো অংশে না থাকে, তা হলে চাপ পড়লে লিভারে খোঁচা লেগে মারাত্মক রক্তপাত হতে পারে। কব্জি থাকবে সূঁচালো অংশের মোটামুটি ২ ইঞ্চি ওপরে। আঙুল যেন পাঁজরের ওপর না থাকে, তা হলে চাপ পড়ে পাঁজর ভাঙতে পারে।

প্রথম হাতের ওপর অন্য হাতের কব্জি রেখে সামনে ঝুঁকুন যাতে আপনার কাঁধ রোগীর বুক বরাবর থাকে।

কনুই সোজা রেখে সোজা নিচের দিকে চাপ দিন।

এমনটা করুন মিনিটে ১০০ বার করে। আপনি একা থাকলে ১৫ বার বুকে চাপ দেওয়ার পর দ্রুত ২ বার ফুঁ দিতে থাকুন।

ভালো হয় দু'জন উদ্ধারকারী হলে। তা হলে শ্বাস দেওয়ার জন্য হার্টে চাপ দেওয়ায় ছেদ পড়ে না। এ ক্ষেত্রে একজন মিনিটে ১০০ বার হারে বুকে চাপ দেবেন, অন্য জন প্রতি ৫ বার বুকে চাপ দেওয়ার পর একবার ফুঁ দেবেন।

কেবল বুকে চাপ দিয়ে CPR

এক্ষেত্রে আগের মতো করেই বুকে চাপ দিতে হবে মিনিটে ১০০ বার হারে। স্টারনামে চাপ দিলে ফুসফুসেও কিছুটা বাতাস ঢোকে।

লেখক পরিচিতি : ডা. তাপস মণ্ডল, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, এম আর সি পি, কানাডায় ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির চিকিৎসক ও অধ্যাপক।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায় : হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৯৬৭৪১৬২০৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

আর্সেনিক বিষণ — এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

মাটির নীচ থেকে তোলা জলে আর্সেনিক আসছে। এটা সারা বিশ্বের সমস্যা হলেও, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গে এর প্রকোপ খুব বেশি। বিগত শতাব্দীর আটের দশকের মাঝামাঝি এই সমস্যা প্রথম ধরা পড়ে কলকাতায় স্কুল অফ ট্রপিক্যাল ডিজিজ-এ। তারপর সমস্যা বহুগুণে বেড়েছে, অজস্র মানুষ ভুগেছে, মরেছে, কিন্তু জলকে আর্সেনিকমুক্ত করার ব্যবস্থা হয়নি। এ ব্যাপারে সরকারের তেমন প্রচেষ্টাও চোখে পড়েনি। নানা জেলার নানা গ্রামে ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে লিখছেন **ডা. জয়ন্ত দাস।**

বহরমপুরে যাওয়ার রাস্তাটা এখন খুব খারাপ, আর এই ২০১৪-র বর্ষায় সেটা যে কী বিপজ্জনক হয়েছে বলার নয়! ঠিক দুক্কুরবেলা বারোটায় কলকাতা থেকে বেরিয়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক নামক অন্তহীন খানাখন্দের মিছিল পেরিয়ে রাত ন'টায় পৌঁছলাম বহরমপুর। পরদিন সকাল পাঁচটায় ঘুমচোখে তাড়াহুড়ো করে রেডি, অন ইয়োর মার্ক, গো। বিজ্ঞানী, রিসার্চ স্কলার, ডাক্তার আর তাঁদের দলবল, সব মিলিয়ে সাতজন টাটা সুমোর যাত্রী। আর গাড়ির মেঝেয় মাথায় ভর্তি নানা সাজ-সরঞ্জাম কাগজপত্র। গন্তব্য ব্লক ডোমকল, গ্রাম কুশা..., এই রে, সব কিছু তো খুল্লাম খুল্লা বলা যাবে না, রোগীদের পরিচয় গোপন রাখার একটা দায় থাকে ডাক্তারের ওপর! অবশ্য তাতে বড় কিছু যায় আসে না, ডোমকলের অনেক গ্রামের অবস্থাই ওই একই রকম। শুধু ডোমকল নয়, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দুই চব্বিশ পরগণা, নদীয়া—সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই 'কুশা' গ্রামগুলো। আমাদের সেদিনের 'কুশা' গ্রামের এক প্রাইমারি স্কুলে ক্যাম্প, আর্সেনিক ক্যাম্প। বহরমপুর থেকে ৫০-৬০ কিলোমিটার দূরে, বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি, চারদিকে পাটক্ষেত, মোবাইলে টাওয়ার নেই।

> অন্তত ছ'মাস আর্সেনিক দূষিত পানীয় জল খেলে এবং রোগীর ত্বকে সুনির্দিষ্ট রোগলক্ষণ থাকলে তবেই বলা যাবে যে আর্সেনিকোসিস হয়েছে।

স্কুলের দোতলা পাকা বাড়ি, চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস হয়। প্রথম শ্রেণির ক্লাস ঘরটা সবচেয়ে বড় আর অন্ধকার, তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণি দোতলায়, একটু ছোট কিন্তু সাফসুতরো ঘর, দিব্যি আলো আসে। আলো না এলে আমার বিপদই সবচেয়ে বেশি, কেন না দোতলায় সেখানেই আমাদের ক্যাম্প, আর ক্যাম্পে চোখে দেখে আমাকেই নিদান হাঁকতে হয় কোন্ রোগী আর্সেনিক-জনিত ক্রনিক রোগে ভুগছেন। পরিভাষায় বললে, ক্লিনিক্যালি কনফার্মড আর্সেনিকোসিস—সেটা কার আছে আর কার নেই, সেটা সব থেকে বেশি ভাল বোঝা যায় তাঁর ত্বক পরীক্ষা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর্সেনিকোসিস-এর সংজ্ঞাও দিয়েছেন ওই ভাবেই— অন্তত ছ'মাস আর্সেনিক দূষিত পানীয় জল খেলে এবং রোগীর ত্বকে সুনির্দিষ্ট রোগলক্ষণ থাকলে তবেই বলা যাবে যে আর্সেনিকোসিস হয়েছে। আর্সেনিকোসিসে অন্য অঙ্গও আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু ত্বক বা চামড়া আক্রান্ত বেশি হয়, আর ত্বকে আর্সেনিকোসিসের রোগলক্ষণ বেশ সুনির্দিষ্ট, চট করে অন্য ত্বকরোগের সঙ্গে গুলিয়ে যায় না।

একে একে মানুষজন এলেন, আর আমাদের কাজও শুরু হলো। আমাদের এই ক্যাম্পে কাজ বলতে কিন্তু ক্রনিক আর্সেনিক বিষণ তথা 'আর্সেনিকোসিস'-এর চিকিৎসা নয়। আসলে আর্সেনিকোসিসের প্রামাণ্য সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই, শরীরে আর্সেনিক যাতে না ঢোকে সেটা দেখাই আর্সেনিকোসিস আটকানোর একমাত্র প্রমাণিত রাস্তা। সুষম আহার পেলে আর্সেনিকোসিসের রোগলক্ষণ কম হয়, বা দেরি করে হয়, এটা দেখা গেছে। তা হলে যার আর্সেনিকোসিস হয়েই গেছে তাঁর কী করণীয়? করণীয় ওই একই, আর্সেনিক এড়িয়ে চলা। যাদের আর্সেনিকোসিসের রোগলক্ষণ মৃদু, তাঁদের লক্ষণগুলো প্রায়শই স্রেফ আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল দিলেই কয়েক বছর পরে কমে যায়। সেটা দেওয়া তো 'মেডিক্যাল' ক্যাম্পের বা কোনও ক্যাম্পেরই কাজ নয়। সেটা দিতে পারেন সরকার, তাঁর পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দফরের সাহায্যে। আমরা কেবল আর্সেনিকোসিসের রোগীদের রোগলক্ষণ লিপিবদ্ধ করি, আর তাঁদের পানীয় জল, চুল, নখ, প্রস্রাব, রক্ত এই সব সংগ্রহ করি—সেগুলো আমাদের গবেষণার কাজে লাগে। আর্সেনিকোসিসের রোগীদের আর্সেনিকোসিস রোগটা সারানোর কোনও চেষ্টাই আমরা করতে পারি না। তবে মেডিক্যাল ক্যাম্পে এসে তাঁরা তাঁদের অন্য পাঁচটা সমস্যা দেখিয়ে নিতে পারেন, ডাক্তারি পরামর্শ পেতে পারেন, আর আমাদের ব্যাগে করে সাধারণ কিছু রোগের ওষুধ নিয়ে যাই, সেগুলো পেতে পারেন। ওঁদের কাছে এটাই বেশ বড় পাওয়া, আর এই পাওয়ার তুচ্ছতা আমি জানি বলেই ওঁদের 'বড় পাওয়া' আমার কাছে বড় লজ্জা, বড় দুঃখ হয়ে দেখা দেয়।

ক্যাম্পের রোগী

সে যাকগে, আমার এদিনের দু' একজন রোগীর কথা বলা শুরু করি বরং। শেখ শাহজাহান, লম্বা সটান চেহারা, মেদের এক ছটাক বাহুল্য নেই, সাদা চুল দাড়ি, বয়স বলেন ৫৪, দু-পাঁচ বছরের এদিক সেদিক হতেই পারে। থিয়েটারে বাদশাহ শাহজাহানের ভূমিকায় মন্দ মানাবে না। বড়-কৃষক পরিবারের ছেলে, এখন জমি ভাগ হতে হতে ক্ষুদ্র কৃষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হল। বছর পঁচিশেক আগে তাঁর গায়ে কালো-সাদা কী সব ছোপ দেখা দেয়। তখন বোঝেন নি, কিন্তু আজ জানেন, সেটাই ছিল আর্সেনিকোসিসের প্রথম লক্ষণ, আজ ডাক্তার দেখে বলবেন 'রেন ড্রপ পিগমেন্টেশন' বা বৃষ্টির ফোঁটার মতো সাদা কালো দাগ। টিউবওয়েলের জল খেতেন শাহজাহান, যেমন খেতেন তাঁর পাড়া-প্রতিবেশি প্রায় সবাই। সরকার থেকে বছর দশেক আগে সেই টিউবওয়েল 'সিল' করে দিয়ে

গেছে। সেটা আরও দশ বছর আগে করলে হয়তো অনেকটা নিস্তার পেতেন। তা হয়নি, আর গায়ে গালো-সাদা ছোপ বেরনোর পরে হাতের পাতায় আর পায়ের পাতায় গুটি গুটি বেরোতে থাকে, সেগুলো ক্রমে বড় হয় আর শক্ত হয়, তখন কাজ করতে গেলে ব্যথা করত হাতে, খালিপায়ে হাঁটতে পারতেন না। আজ ডাক্তার দেখে বলেন, 'প্লান্টার কেরাটোসিস' আর 'পামার কেরাটোসিস', তথা হাত-পায়ের পাতার জায়গায় জায়গায় উপরিত্বক মোটা হয়ে যাওয়া। তার পর শেখ শাহজাহানের জায়গায় জায়গায় কেমন লাল লাল ঘা-ঘা হতে লাগল— পেটে, বুকে, হাতে, ঘাড়ে। দৌড়লেন বহরমপুর। প্রথমে যে ডাক্তার দেখালেন তিনি পাঠালেন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। তিনি বললেন, করেছেন কী, এ তো ক্যানসার! চামড়ার ক্যানসার। কিন্তু এতগুলো জায়গায় চামড়াতে হঠাৎ করে ক্যানসার হল কেন? চর্মরোগ বিশেষজ্ঞও প্রথমে বুঝতে পারলেন না। মুর্শিদাবাদ জেলায় অজস্র আর্সেনিকোসিস রোগী, তাঁর হয়তো প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেলা উচিত ছিল, তবু তাঁর সপক্ষে বলার মতো একটা কথা আছে। আর্সেনিকোসিসের রোগীরা সবাই প্রায় গরিব ও গ্রাম্য, শহরের ডাক্তার তাঁদের বিশেষ দেখেন না, দেখেন গ্রামের কোয়াক ডাক্তার। বহরমপুরের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ তাই এরকম 'কেস' বিশেষ দেখেননি। আর যেহেতু বিলেতে এই সব রোগ প্রায় নেই বললেই চলে, তাই যে সব বিলেতি বই আর জার্নাল পড়ে আমি বা তিনি বিদ্যা অর্জন করি, তাতে আর্সেনিকোসিসের উল্লেখ নেই। যাই হোক, শেষে ডাক্তারবাবু তো বুঝলেন আর্সেনিকোসিস, কিন্তু তিনি আর ক্যানসার নিয়ে কী চিকিৎসা করবেন, পাঠালেন সার্জনের কাছে।

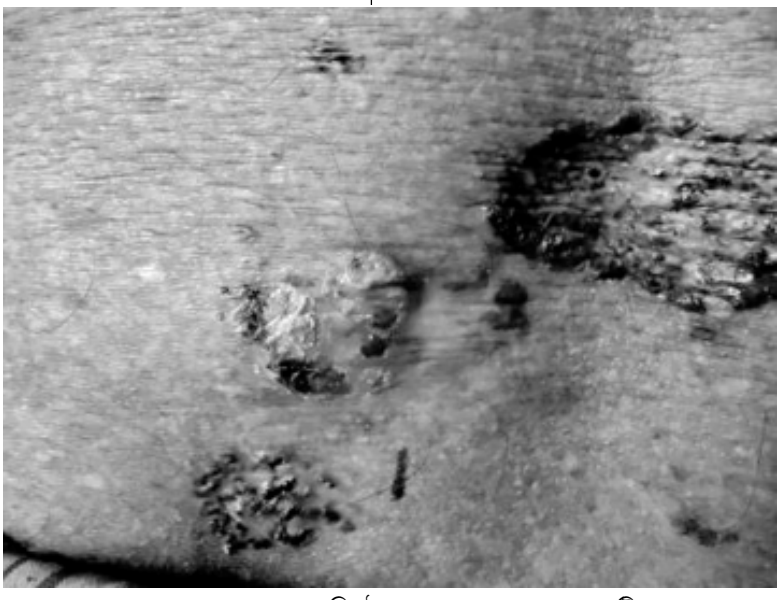

শেখ শাহজাহানের পিঠে অজস্র ক্যানসারের দু-একটি

সেই শুরু। সেই থেকে শেখ শাহজাহান (আসল নাম নয়, ওই থিয়েটারে শাহজাহান সাজলে মন্দ লাগবে না বলে আমার দেওয়া নাম) ৩৪ বার অপারেশন করিয়েছেন, ৮৭ টি টিউমার তাঁর ত্বক থেকে কেটে বাদ দিয়েছেন সার্জনরা। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একেবারে 'আসল' কথা, ৮৭টা ক্যানসার জাতীয় টিউমার! বায়োপ্সি করিয়েছেন প্রায় প্রত্যেক বার—রিপোর্টে এসেছে হয় 'স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা' বা 'বেসাল সেল কারসিনোমা'। 'কারসিনোমা' কথাটার মানে ক্যানসার। তবে একবার রিপোর্ট এসেছিল 'বাওয়েন'স ডিজিজ'। সেটাও ক্যানসারের পূর্বসূরি, এর থেকে সাধারণত 'স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা' তৈরি হয়। এদিন পরীক্ষা করে দেখলাম, তাঁর চামড়ায় ছ'টি নতুন জায়গায় ক্যানসার হয়েছে, আর পাঁচটা আগে অপারেশন করা জায়গায় ক্যানসার ফিরে এসেছে। সবগুলোই 'স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা' বলে মনে হল, তবে সেটা নিশ্চিত করতে বায়োপ্সি করতে হবে।

> ৩৪ বার অপারেশন করিয়েছেন, ৮৭ টি টিউমার তাঁর ত্বক থেকে কেটে বাদ দিয়েছেন সার্জনরা ৮৭টা ক্যানসার জাতীয় টিউমার

তবে শেখ শাহজাহানের শরীরে আর্সেনিকোসিসের সমস্ত রোগলক্ষণ ফুটে বেরিয়েছে, তা নয়। তাঁর ত্বকে আর্সেনিক জনিত প্রায় সব রকম ব্যধিই আছে, কিন্তু স্নায়ুর কোনও রোগ নেই, লিভারের রোগ নেই। আর্সেনিকোসিসে সেসবও হতে পারে। চোখ লাল হয় শাহজাহানের, জ্বালা করে— সেটাও আর্সেনিক রোগের একটা লক্ষণ।

শেখ শাহজাহানকে ছেড়ে আমরা বরং রেশমা বেওয়া'র কথা শুনি এবার। 'রেশমা' নামটা আমার দেওয়া, তাঁর আসল নাম অন্য কিছু। কিন্তু 'বেওয়া'-টা সত্যিই তাঁর নামের অংশ। বেওয়া আনে বিধবা। স্বামী ছিলেন শেখ মান্নান, মারা গেছেন তিন বছর আগে। আর্সেনিকের জন্য গায়ে অনেকগুলো ক্যানসার হয়েছিল, কিন্তু তাতে মারা যাননি মান্নান। তাঁর শ্বাসের সমস্যা হয়েছিল, খুব রোগা হয়ে গেছিলেন, খেতে পারতেন না কিছুই। বহরমপুরের ডাক্তার বলেছিলেন পরীক্ষা করাতে হবে, সে পরীক্ষার খরচ অনেক বলে করাতে পারেননি। রেশমা বেওয়ার পুঁটলির কাগজ ঘেঁটে দেখলাম এন্ডোস্কোপি করতে বলেছিলেন ডাক্তার। শ্বাসের সমস্যা আর খেতে না পেয়ে শুকিয়ে যাওয়া---- ঠিক কোনটাতে যে এন্তেকাল হল শেখ মান্নানের সেটা তাঁর বিধবা স্ত্রী জানেন পারেননি, কোনও দিন জানতে পারবেনও না। আর্সেনিক বিষণে শ্বাস আর পেট— এ দুয়েরই সমস্যা হতে পারে। কিন্তু কাগজপত্রে কোথাও লেখা নেই শেখ মান্নানের মৃত্যুর সঙ্গে আর্সেনিকের কোনও সম্পর্ক আছে। বিষাক্ত মদ খেয়ে মরলে ক্ষতিপূরণ দেয় রাজ্য সরকার, আর্সেনিকে দেয় না। তাই রেশমা বেওয়া তাঁর স্বামীর কাগজপত্র কিছু রেখেছেন, কিছু হারিয়েছেন। আর আমাদের কাছে এসেছেন কোমরের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন বলে, সেটা খুব সম্ভব আর্সেনিকের জন্য নয়। আমি পরীক্ষা করে দেখি গায়ে অনেক ছিট ছিট দাগ, সেগুলো আর্সেনিকের জন্য। বলি সে কথা। রেশমা বেওয়া তাতে কান পাতেন না। কোনও অসুবিধা তো করছে না ওই দাগগুলো, না ব্যথা না জ্বালা। তার চেয়ে ডাক্তারবাবুরা যদি কোমর ব্যথার একটা সুসার করেন তো তিনি একা মুরগী-ছাগল পে'লে নিজের দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করতে পারবেন।

রেশমা বেওয়া'কে এদিনই প্রথম দেখলাম, তবে শেখ শাহজাহানকে আগেই দেখেছিলাম কলকাতায় বসে। তিনি শুনেছিলেন

আর্সেনিক নিয়ে কাজ করছি আমরা, তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে যদি কিছু করতে পারি সে আশায় এসেছিলেন আমাদের কাছে। কয়েকটা অপারেশন কলকাতার সরকারি হাসপাতালে প্রায় নিখরচায় করানোর ব্যাপারে কিছুটা সুবিধা করে দেওয়া গিয়েছিল, তাতেই তিনি বেজায় কৃতজ্ঞ। কে বলবে, সরকার ঠিকঠাক কাজ করলে ওই রোগটাই তাঁর হওয়ার কথা নয়!

আর্সেনিক জলের সঙ্গে এসে ফসলেও ঢুকছে, সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের সবার খাবারে।

ডোমকলে এই স্কুলের কাছে আর একটা জায়গায়, এক ক্লাবঘরে, আর্সেনিক ক্যাম্প করেছিলাম বছর দু'য়েক আগে। সেই ক্যাম্পের কিছু রোগী এসেছেন। তাঁদের মধ্যে যাদের রোগ কম ছিল তাঁরা ভালই আছেন, কেন না সরকার থেকে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে ওখানে। কিন্তু যাদের রোগ বেশি ছিল তাঁদের রোগের কষ্ট কমেনি, বরং বেড়েছে। একটা পর্যায়ের পর, যেমন ক্যানসার একবার হয়ে গেলে, আর্সেনিকমুক্ত জল খেলেও রোগ আটকে থাকে না, বাড়তে থাকে। সুনীল প্রামাণিক, দু'বছর আগে ক্যাম্পে দেখেছিলাম। বয়স পঞ্চাশ, তাঁর চামড়ায় দাগের সঙ্গে হয়েছে নার্ভের সমস্যা। হাত পায়ে জোর কমে গেছে, মাংসপেশিগুলো জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে গেছে। কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে নার্ভগুলো কমজোরী হয়ে গেছে। এটা আর্সেনিকোসিসের একটা জানা লক্ষণ। তিনি গত সাত বছর আর্সেনিকমুক্ত জল খাচ্ছেন, কিন্তু তাতে রোগ কমছে না একটুও। আর এই নার্ভের রোগের কোনও চিকিৎসাও জানা নেই। কাজ করতে পারছেন না, সেলুন ছিল, বন্ধ করে দিতে হয়েছে, দাড়ি কামাতে গিয়ে খদ্দেরের গাল কেটে ফেলবেন এমন অবস্থা। কোনও রোজগার নেই, না খেতে পেয়েই মারা যাবেন হয়তো একদিন। মানুষকে খাওয়ানোর জন্য না কি সবুজ বিপ্লব, আর সবুজ বিপ্লবের জন্য মাটির তলার জল তোলার হুড়োহুড়ি, এখন তো সেই জলই না খেতে দিয়ে মারছে সুনীল প্রামাণিকদের। কোনও সরকারি সাহায্য নেই। আর আর্সেনিক জলের সঙ্গে এসে ফসলেও ঢুকছে, সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের সবার খাবারে। এই ভাবে স্থানীয় সমস্যা সর্বজনীন হয়ে উঠছে। বড় ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, কিন্তু ক্ষমতায় যারা আছেন তাঁরা কার্যত অন্ধ। রাষ্ট্রশক্তি ধৃতরাষ্ট্র।

স্কুলের টিউবওয়েল-লাল রং মানে বলে খুব বেশি আর্সেনিক

স্কুলের কথা :

স্কুলের কথা একটু বলি। ক্যাম্পের জন্য স্কুল আধা-বন্ধ। এমনি মিড ডে মিল, অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের দুপুরের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, আছে রান্নাঘর। ক্যাম্পের জন্য ক্লাস হয়নি, রান্নাও বন্ধ, ছেলেমেয়েদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্যাকেট-খাবার। কী দিয়েছে দেখতে পেলাম না, কেন না ক্যাম্পে রোগী দেখা প্রায় শেষ করে যখন একটু ফুরসৎ মিলল তখন বাচ্চারা সব বাড়ির পথে। একজন দিদিমণি আর একজন মাস্টারমশাই বসে ছিলেন স্কুলের দায়িত্ব নিয়ে, তাঁদের সঙ্গে কথা বললাম।

স্কুলের মধ্যে একটাই খাবার জলের উৎস। একটা টিউবওয়েল বা নলকূপ। দিদিমণি বললেন, কয়েক বছর আগে সরকার থেকে ওটার জল পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিয়েছেন, জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পানীয় জলে আর্সেনিকের একটা উর্ধ্বতম মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তার বেশি আর্সেনিক থাকলে সেই জল নিরাপদ নয়। ভারত সরকার বলেছেন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া মান না কি বড্ড কঠিন, অত করা যাবে না। তাই ভারতীয় মাত্রা একটা ঠিক করেছেন সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাত্রার চাইতে পাঁচগুণ। আর সেই মাপ মেনে সরকারি সংস্থা আর্সেনিক অধ্যুষিত অঞ্চলে গিয়ে নলকূপ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখছেন। ভারতীয় মানের চাইতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি পেলে তাঁরা বলে দিচ্ছেন, এই নলকূপের জল বিপজ্জনক, আর সেই নলকূপের গায়ে লাল রঙের একটা দাগ দিয়ে দিচ্ছেন। অথচ কোথাও তাঁরা সেই নলকূপগুলো 'সিল' বা বন্ধ করে দিচ্ছেন, কোথাও তা দিচ্ছেন না। এই স্কুলের নলকূপটাতে তাঁরা লাল দাগ দিয়েছেন, কিন্তু সিল করেন নি।

দিদিমণি বললেন, আমরা বোতলে করে জল আনি, এই টিউবওয়েলের জল কখনই খাই না। ছাত্রছাত্রীদেরও বারণ করি, এই জল খেও না। কিন্তু বারণ শোনে কি তারা? কেউ কেউ শোনে, বিশেষ করে যাদের বাবা-মা একটু অবস্থাপন্ন, একটু শিক্ষিত, একটু সচেতন। তাঁরা বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানোর সময় হাতে জলের বোতল দিয়ে দেন, বলে দেন, টিউবওয়েলের জল খাবি না। কিন্তু অধিকাংশ বাচ্চাই স্কুলে এসে এই জল খায়। কী করবে? কাছাকাছি আর কোনও জলের ব্যবস্থা নেই যে।

মিড ডে মিল রান্না হয় কোন জলে? আমার প্রশ্নে দিদিমণি কিঞ্চিৎ বিপন্ন বোধ করেন। তারপর তিনি আর মাস্টারমশাই মিলে বলতে থাকেন— মিড ডে মিল রান্না হয় ওই টিউবওয়েলের জলেই। উপায় নেই। শুধু মিড ডে মিল রান্না কেন, কাছাকাছি থাকে যে সব পরিবার তাঁরাও সব কাজেই ওই টিউবওয়েলের জলই ব্যবহার করেন। রান্না করেন, পান করেন ওই জলই। দিদিমনি আর মাস্টারমশাই বলেন, তাঁদের প্রত্যেক বছর সরকারের কাছে, পঞ্চায়েতের কাছে রিপোর্ট দিতে হয়। তাতে লিখে দেন, স্কুলে একটা মাত্র পানীয় জলের উৎস, আর সরকার নিজে সেটার জল কোনও ভাবেই খেতে বারণ করেছেন। লেখেন, কাছাকাছি কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। দু-একবার নেতাদের বলেছেন। পঞ্চায়েত থেকেও নাকি রিপোর্ট যায় সরকারে, আর সেখানেও না কি কথাটা লেখা হয় বারবার। গ্রামস্তরের পঞ্চায়েত নেতারা নাকি 'ওপরমহলে' তদ্বির করেছেন। ফল হবে হয়তো একদিন।

আচ্ছা, আমাদের কোনও মন্ত্রী, নিদেনপক্ষে শাসক দলের নেতা এম এল এ-র বাচ্চাকে ওই স্কুলে পড়ালে কেমন হয়?

লেখক পরিচিতি : ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, কলকাতার একটা সরকারি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের আর্সেনিক-গবেষণা কর্মসূচির সঙ্গে গত ১২ বছর ধরে যুক্ত

অ্যান্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহার

"ডাক্তারবাবু, পরশু অফিস যেতেই হবে। কড়া একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সারিয়ে দিন না জ্বরটা" কিংবা, "ওঃ, এই ছোট্ট বাচ্চাকে দুমদাম অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে কেন রে তোদের ডাক্তার!" এ সব কথা এখন হাটে বাজারে কান পাতলেই শোনা যায়। কিন্তু কখন কাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া ঠিক আর কখন ভুল, তার সামান্য ধারণাও হয়তো আমাদের অনেকেরই নেই। অথচ এই ধারণা থাকা খুব জরুরি। ব্যাপারটা খুব সোজা নয়, আবার ভয়ানক কঠিনও কিছু নয়— লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ।**

ডাক্তারবাবুরা যদি অ্যান্টিবায়োটিক ঠিকঠাক ব্যবহার করতেন আর রোগীরা যদি নিজেরা বা পাড়ার ওষুধের দোকানদারের কথায়, কিংবা মেসোমশাই-কাকিমণিদের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া এবং না খাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিতেন, তা হলে আমাদের এই প্রবন্ধ লেখার দরকারই হয়তো হতো না। কিন্তু ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত অ্যান্টিবায়োটিক-ব্যবহারের ব্যাপারে ভারী গণতান্ত্রিক, যে যার মতো করে ওষুধটা প্রেসক্রাইব করেন, আর সে ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে যথেচ্ছাচার চলে। আর তাই—

- জীবাণুনাশক প্রতিরোধী (অ্যান্টিবায়োটিক- রেজিস্ট্যান্ট) জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ সাধারণ চিকিৎসায় সারছে না, ফল—ভোগান্তি, অনেক সময় মৃত্যু।
- যক্ষ্মার জীবাণুর বিরুদ্ধে যখন সাধারণ যক্ষ্মার ওষুধ কাজ করে না, তখন সেই জীবাণু সংক্রমণে হয় বহু ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা (multidrug-resistant tuberculosis বা MDR-TB)। এ ধরনের যক্ষ্মায় প্রতি বছর আক্রান্ত হচ্ছেন ৪ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ, মারা যাচ্ছেন ১ লক্ষ ৫০ হাজার।
- ভারতের মতো যে সব দেশে ম্যালেরিয়া সারা বছর লেগে থাকে, সে সব দেশে ব্যাপক ভাবে ম্যালেরিয়ার পরজীবীর বিরুদ্ধে ক্লোরোকুইন ও সালফাডক্সিন-পাইরিমেথামিন-এর মতো পুরনো ম্যালেরিয়ার ওষুধ আর কাজ করছে না।
- হাসপাতালে অন্য কারণে ভর্তি থাকাকালীন রোগীরা এমন সব জীবাণুতে সংক্রামিত হচ্ছেন, যাদের বিরুদ্ধে অনেক দামি জীবাণুনাশকও কাজ করে না।

এ সব ঘটনার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী অ্যান্টিবায়োটিক তথা জীবাণুনাশকের অযথা ও অযৌক্তিক ব্যবহার। তবে এই বিপদ কেবল ভারতে সীমাবদ্ধ নেই, অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই অবস্থাটা একই রকম। ফলে জীবাণুনাশক-প্রতিরোধী জীবাণু তৈরি হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে আর বেঁচে থাকছে। 'উন্নত' দেশে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের গাইডলাইন আছে, আর সেটা মোটের ওপর মেনে চলা হয়; ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক দোকান থেকে পাওয়া যায় না। আমরা এখানে আমাদের দেশ বা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের কথাই কেবল আলোচনা করব।

অ্যান্টিবায়োটিক আর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল

অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) মানে—জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ বা অন্য জীবাণুকে মারে বা তার বংশবৃদ্ধি রোধ করে। অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক প্রাকৃতিক পদার্থ। এখন কিন্তু জীবাণু মারার ওষুধ হিসেবে যে সব ব্যবহৃত হয় তাদের অধিকাংশই হয় পুরোপুরি কৃত্রিম, কিংবা প্রাকৃতিক পদার্থে বড় ধরনের রাসায়নিক অদল-বদল করে তৈরি। ব্যাকরণ মানতে গেলে এদের সবাইকে এক সঙ্গে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল (antimicrobial) নামে ডাকতে হয়। কিন্তু মানুষ সব ধরনের জীবাণুনাশককেই অ্যান্টিবায়োটিক বলেন সাধারণত। আমরাও এই প্রবন্ধে অ্যান্টিবায়োটিক বলতে দেহে প্রয়োগ করা যায় এমন সমস্ত জীবাণুনাশককেই বোঝাব। বাংলায় বললে অবশ্য অসুবিধা নেই, কেন না অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল দুইয়েরই বাংলা জীবাণুনাশক। তবে অ্যান্টিবায়োটিক কথাটা মনে হয় আমাদের কাছে বেশি পরিচিত, তাই জীবাণুনাশক ও অ্যান্টিবায়োটিক—এ দু'টো শব্দই আমরা এখানে একই অর্থে ব্যবহার করব।

লাইসল, ফিনাইল, স্যাভলন জাতীয় জিনিস, যা দিয়ে আমরা ঘর, বা অপারেশনের ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি পরিষ্কার করি, অনেক সময় ক্ষতস্থান ধুই, ইংরেজিতে তাদের বলে অ্যান্টিসেপটিক। বাংলায় এদেরও জীবাণুনাশক বলার চল আছে। এরা কিন্তু একেবারেই অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় জিনিস নয়, কেন না মানুষের শরীরের কোষের মধ্যে ঢুকে জীবাণু মারার কাজে এদের ব্যবহার করা যায় না। তাই বাংলায় আমরা যখন 'জীবাণুনাশক' শব্দটা বলব তখন এদের কথা বোঝাব না।

এ ছাড়াও প্রাকৃতিক নানা জিনিসে অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য জীবাণু মারার মতো রাসায়নিক থাকে, এবং নানা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাব্যবস্থায় যে সব উদ্ভিদ ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে আসছে বহুদিন যাবৎ, তাদের অনেকের মধ্যে এই ধরনের রাসায়নিক থাকতে পারে, আমাদের আজকের আলোচনায় তাদের কথাও বলব না। আমাদের আলোচনা কেবল আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণুনাশক নিয়ে।

জীবাণুনাশক কী ভাবে কাজ করে?

মনে রাখবেন— কেবল জীবাণুনাশকে আমরা জীবাণু-সংক্রমণ থেকে সেরে উঠি, ব্যাপারটা এমন নয়। শরীরের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ও জীবাণুনাশক এক সঙ্গে মিলে কাজ করে উদ্দেশ্য-সাধন করে।

জীবাণুকোষের নানা জায়গায় বিভিন্ন জীবাণুনাশক কাজ করতে পারে। আমাদের খুব পরিচিত কয়েকটা অ্যান্টিবায়োটিক কোথায় কাজ করে সেটা দেখে নিন—

- পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিন ইত্যাদি কাজ করে কোষের দেওয়ালে।
- ফ্লুকোনাজোল, মাইকোনাজোল ইত্যাদি কাজ করে সাইটোপ্লাসমিক পর্দার ওপর।
- ক্লোরামফেনিকল, এরিথ্রোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, অ্যামাইনো-গ্লাইকোসাইড ইত্যাদি জীবাণুকোষে প্রোটিন-সংশ্লেষে বিঘ্ন ঘটায়।
- কুইনোলোন, মেট্রোনিডাজোল, রিফামপিসিন, সালফোনামাইড, ট্রাইমেথোপ্রিম ইত্যাদি আবার নানা ভাবে নিউক্লিক অ্যাসিড বিপাকে বাধা ঘটায়।

এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আমাদের খুব পরিচিত বলছি, কিন্তু আপনাদের বোধহয় পেনিসিলিন ছাড়া অন্য নামগুলো অচেনাই ঠেকল। আচ্ছা, যদি 'মেট্রোনিডাজোল' না বলে বলতাম 'মেট্রোজিল', তা হলে বোধহয় চিনতেন ওষুধটা। বা 'ক্লোরামফেনিকল' নামটার বদলে যদি বলতাম 'ক্লোরোমাইসেটিন', তা হলেও অন্তত বয়স্ক মানুষদের নামটা পরিচিত ঠেকত। আসলে আমাদের পরিচিত নামগুলো 'মেট্রোজিল', 'ক্লোরোমাইসেটিন', 'সিফরান', 'সেপট্রান'— এগুলো সব কোম্পানির দেওয়া নাম। একটাই অ্যান্টিবায়োটিক, কিন্তু এক একটা কোম্পানি তাকে এক একটা নামে বাজারে ছাড়ে— এটাই হল ওই অ্যান্টিবায়োটিকের 'ব্র্যান্ড নাম'। যেহেতু বাজারে সেটা কোম্পানির দেওয়া নামে অর্থাৎ ব্র্যান্ড নামে বিক্রি হয়, সেহেতু বাজারে বেশি চালু ব্র্যান্ড নামগুলোই আমাদের বেশি জানা থাকে। এই 'ব্র্যান্ড নাম'-এর ফলে কোম্পানির মুনাফা বাড়ে, রোগীর খরচ বাড়ে, চিকিৎসায় বিভ্রাট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু সে নিয়ে আলোচনা আমরা 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'র পাতায় আগে অনেক করেছি, আবারও করব, আপাতত ফিরে আসি অ্যান্টিবায়োটিকেই। চট করে দেখে নিই এর ইতিহাসের দু-চারটি মাইল ফলক।

অ্যান্টিবায়োটিকের ইতিহাস—প্রথম পাতা

গ্রিকরা কৃমি মারার জন্য পুরুষ ফার্ন ব্যবহার করতেন, আজটেকরা ব্যবহার করতেন চিনোপোডিয়াম (chenopodium)। হিন্দুরা কুষ্ঠের চিকিৎসা করতেন চালমুগরা দিয়ে। ঘা শুকোতে ঘায়ে ছত্রাক লাগানো হত কয়েকশ' বছর ধরে। ষোড়শ শতাব্দীতে সিফিলিসের চিকিৎসায় পারদের ব্যবহার শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ম্যালেরিয়ায় সিঙ্কোনা গাছের ছাল ব্যবহার করা শুরু হয়। কিন্তু জীবাণু মারার ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার শুরু হয় আরও পরে।

> 'ব্র্যান্ড নাম'-এর ফলে কোম্পানির মুনাফা বাড়ে, রোগীর খরচ বাড়ে, চিকিৎসায় বিভ্রাট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিখ (১৮৫৪-১৯১৫) দেখেন কোষকলার আণুবীক্ষণিক প্রস্তুতিতে অ্যানিলিন রং (aniline dyes) জীবাণুগুলোকে রং করে এবং কোষকলার ক্ষতি না করে কেবল জীবাণুগুলোকে মারতেও পারে। তিনি সিফিলিসের প্রথম ওষুধ সালভারসান আবিষ্কার করেন। অনেক পরে রঞ্জক থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ পামাকুইন ও মেপাক্রিন আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩৫-এ প্রথম সালফোনামাইড প্রন্টোসিল কাজে লাগানো হয়। সন্তান জন্মের পর প্রসূতির জীবাণুসংক্রমণে, নিউমোনিয়ায় ও মেনিঞ্জাইটিসে সালফোনামাইডগুলোকে চমকপ্রদ কাজ করতে দেখা যায়।

জীবদেহ থেকে কার্যকর জীবাণুনাশক পাওয়া যেতে পারে— এই ধারণার ওপর ভর করে নতুন ধরনের জীবাণুনাশক পাওয়ার চিন্তা করছিলেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, অনেক চেষ্টাও করছিলেন বেশ কয়েক বছর ধরেই। ১৯২৮-এ প্রায় হঠাৎ করেই তিনি দেখলেন যে পেনিসিলিয়াম ছত্রাক জীবাণুর বংশবৃদ্ধি আটকাতে পারছে। ১৯৩৯-এ হাওয়ার্ড ওয়াল্টার ফ্লোরি আর আর্নেস্ট বরিস চেন অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে এক গবেষণা চালাচ্ছিলেন। অ্যান্টিবায়োটিক মানে—জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ যা অন্য জীবাণুকে মারে বা তার বংশবৃদ্ধি রোধ করে। এই গবেষণা করতে গিয়ে পেনিসিলিয়াম ছত্রাক থেকে পেনিসিলিনের আবিষ্কার। এরপর আস্তে আস্তে অজস্র অ্যান্টিবায়োটিক।

অ্যান্টিবায়োটিকের ইতিহাস— দ্বিতীয় পাতা

অ্যান্টিবায়োটিক ইতিহাসের প্রথম পাতায় দেখা গেল ওষুধের জগতে অ্যান্টিবায়োটিক যেন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার—এলো, জীবাণুদের কচুকাটা করল, আর মানব জাতির রোগ ইতিহাসের ধারাটাই পালটে দিল। জীবাণুঘটিত যে সব রোগে আগে মানুষ মরত পঙ্গপালের মতো, তাদের জয় করল অ্যান্টিবায়োটিক। কিন্তু ইতিহাসের দ্বিতীয় পাতাটা এত সরল নয়। সরল নয়, কেন না জীবাণুরা খুব ছোট্ট প্রাণী বটে, কিন্তু কোটি কোটি বছর ধরে তাদের পূর্বসূরিরা পৃথিবীতে টিকে আছে, আর টিঁকে থাকার তাগিদে অবস্থার নানা পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য ক্রমাগত বদলে নিয়েছে নিজেদের। প্রয়োজনে নিজেদের বদলের ক্ষমতা জীবজগতের অন্য সব জীবের মতোই জীবাণুদেরও সহজাত। এই বদলটাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় বিবর্তন বা ইভোলিউশন।

অ্যান্টিবায়োটিক জীবাণুদের নতুন শত্রু। তার সামনে এসে প্রথমে জীবাণুরা মারা পড়ল। কিন্তু এক পরিবারের সব মানুষ যেমন একই রকম নন, তেমনই একই প্রজাতির সব জীবাণু একেবারে এক রকম নয়। যেমন ধরুন 'স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস'। আরে আরে, অমন বিদঘুটে নাম শুনে ঘাবড়াবেন না, বিজ্ঞানীরা অমন নাম দেন নানা কারণে। ফোঁড়া দেখেছেন? সেই যে, চামড়া লাল হয়, ব্যথা হয়, পুঁজ হয়, ফেটে যেতে পারে— বড্ড কষ্টের ব্যাপার। তা ফোঁড়া হওয়ার জন্য

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী হল এই বিদঘুটে নামের জীবাণুটা, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস। আমরা একে ছোট করে কেবল 'স্ট্যাফ' নামে ডাকব। প্রথম যখন পেনিসিলিন ব্যবহার শুরু হল, ধরুন ফোঁড়ার জন্যই, তখন ফোঁড়াতে থাকা অজস্র কোটি 'স্ট্যাফ' জীবাণুদের সবাই মারা পড়ল, আর ফোঁড়া সেরে গেল। না, একটু ভুল বললাম, সব 'স্ট্যাফ' মারা গেল না, অজস্র কোটি 'স্ট্যাফ'-এর মধ্যে একটা হয়তো বেঁচে গেল। বেঁচে গেল, কারণ সেই জীবাণুটা সব ব্যাপারে অন্য 'স্ট্যাফ'দের মতো হলেও একটা ব্যাপারে একটু আলাদা ছিল। পেনিসিলিন কাজ করে জীবাাণুকোষের দেওয়াল গড়তে বাধা দিয়ে। এই আলাদা রকম বেয়াদব 'স্ট্যাফ'টা হয়তো এমন কায়দায় তার কোষের দেওয়াল বানাতো যে অল্প-স্বল্প পেনিসিলিন থাকলেও তার তেমন অসুবিধা হত না। এবার সেই আলাদা রকম 'স্ট্যাফ'টার ভারী মজা, কেন না অন্য সব জীবাণু মারা পড়েছে পেনিসিলিনে, সুতরাং তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই কেউ। সে অবাধে বংশবিস্তার করে চলল, কোটি কোটি ছানাপোনা নাতিপুতি তার। এবং তার সমস্ত বংশধরই কিন্তু জীবাণুকোষের দেওয়াল বানায় এমন করে যে অল্প পেনিসিলিন তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

তারপর হয়তো সেই কোটি কোটি বংশধরের মধ্যে একজন দু'জনের শরীরে আরেকটা পরিবর্তন (মিউটেশন) স্রেফ 'বাই চান্স' ঘটে গেল, আর তার ফলে অনেক অনেক পেনিসিলিন থাকলেও তার কোনও অসুবিধে হয় না। এবার কোনও ফোঁড়ায় সে রকম পরিবর্তন (মিউট্যান্ট) 'স্ট্যাফ' থাকলে, সেখানে পেনিসিলিন অনেক পরিমাণে দিলেও মারা পড়বে অন্যরা, সে যাবে বেঁচে। আর তার ফলে তার বংশধরেরা, যারা পেনিসিলিন অনায়াসে সহ্য করে, তারাই বেশি সংখ্যায় থাকবে।

এখানেই শেষ নয়। এরপর কোনও জীবাণুর কোনও প্রজন্মে এরকম একটা পরিবর্তন (মিউটেশন) স্রেফ 'বাই চান্স' ঘটে গেল, যে সেই জীবাণুর শরীরে পেনিসিলিন অণুটাকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম একটা প্রোটিন তৈরি হল। এটা খুব অসাধারণ ব্যাপার নয়। আমাদের পেটের মধ্যে সুক্রেজ বলে একটা প্রোটিন আছে যেটা চিনির (ইক্ষু শর্করা বা সুক্রোজ) অণুকে দ্রুত ফ্রুকটোজ আর গ্লুকোজ—এই দুটো অণুতে ভেঙে দেয়। তেমনি জীবাণুর কোষে 'বিটা ল্যাকটামেজ' বলে একটা প্রোটিন পেনিসিলিন অণুকে ভেঙে দেয়, আর সেই ভাঙা পেনিসিলিন জীবাণুদের কোষের দেওয়ালের কোনও ক্ষতি করতে পারে না।

জীবাণু জগতে একটা মজার ব্যাপার আছে। একটা কাজের প্রোটিন কোনও জীবাণু একবার তৈরি করে ফেললে, সেই প্রোটিন তৈরির সঙ্কেত বহন করে যে 'জিন', সেটা তার বংশধরদের মধ্যে তো এমনিতেই যায়, এমনকী, অন্য জীবাণু, অন্য প্রজাতির জীবাণু, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবাণুর মধ্যেও সেই জিন চলে যেতে পারে। 'জিন' ব্যাপারটা কী আর সেটা কেমন করেই বা প্রোটিন তৈরির সংকেত বহন করে আর কেমন করে তারা জীবাণু প্রজন্ম পরম্পরায় বাহিত হয় বা অন্য জীবাণু ও অন্য প্রজাতির জীবাণুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, সে নিয়ে আলোচনা অন্য কোনও দিন করব আপাতত খালি জেনে রাখি, এই সব ব্যাপারগুলো হয়। ফলে একটা অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণুনাশকের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্স (ওষুধ-প্রতিরোধ ক্ষমতা) কোনও জীবাণুতে একবার তৈরি হয়ে গেলে সেই জীবাণুই বেশি দেখা যায়, আর সেই রেজিস্ট্যান্স ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্য জীবাণুতেও। এটা মাথায় রেখে এবার আমরা জীবাণুনাশক ব্যবহারের নীতিমালা বুঝতে চেষ্টা করব। তার সঙ্গে এটাও মনে রাখব যে কেবল ওপরের তত্ত্বকথার ওপর ভর করে এই নীতিমালা বানানো হয়েছে, ব্যাপারটা এরকম নয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন, এই সব নীতি মেনে চললে জীবাণু জগতে অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্স কম হয়, এবং সেটা দেখে তবেই তাঁরা সবাইকে এই সব নীতি মেনে চলতে বলছেন।

একটা অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণুনাশকের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্স (ওষুধ-প্রতিরোধ ক্ষমতা) কোনও জীবাণুতে একবার তৈরি হয়ে গেলে সেই জীবাণুই বেশি দেখা যায়, আর সেই রেজিস্ট্যান্স ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্য জীবাণুতেও।

জীবাণুনাশক ব্যবহারের নীতিমালা

- কেবল তখনই জীবাণুনাশক ব্যবহার করা উচিত, যখন তা ব্যবহার করলে লাভ হবে এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত।
- দু'ধরনের জীবাণুনাশক আছে—কম বিস্তৃতির (narrow spectrum), যে গুলো নির্দিষ্ট কম কিছু জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে এবং বড় বিস্তৃতির (broad spectrum), যেগুলো অনেক ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। কোনও জীবাণুতে সংক্রমণ হয়েছে তা জেনে বা আন্দাজ করে কম বিস্তৃতির জীবাণুনাশক ব্যবহার করা উচিত।
- সাধারণ ভাবে একাধিক জীবাণুনাশক একসঙ্গে ব্যবহার না করে একটা ব্যবহার করা উচিত।
- জীবাণুনাশকের মাত্রা ততটা বেশি হওয়া চাই যাতে তা কার্যকরী হয় এবং জীবাণুকে ওষুধ প্রতিরোধ তৈরি করতে না দেয়। আবার মাত্রা যেন এমন না হয় যাতে বিষক্রিয়া হয়।

জীবাণু সংক্রমণের চিকিৎসা

- কোন জীবাণুনাশক দেবেন তা কালচার-সেন্সিটিভিটি পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভর করে ঠিক করা ভাল।

- কালচার-সেন্সিটিভিটির সুযোগ না থাকলে সেই অঞ্চলে এই ধরনের জীবাণু সংক্রমণ কোনও জীবাণু থেকে হয় এবং তা কোন কোন ওষুধে প্রতিরোধী— এই তথ্যের ভিত্তিতে ওষুধ নির্বাচন করা উচিত।
- যত কম দিন সম্ভব জীবাণুনাশক দেওয়া উচিত। সাধারণ ভাবে সাত দিনের বেশি নয়। কোনও ক্ষেত্রে যদি প্রমাণ থাকে যে কম দিনে অসুখ সারবে না তা হলে অবশ্য কথা আলাদা। যেমন যক্ষ্মা-সংক্রমণ, এতে ন্যূনতম ছয় মাস ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।
- আবার, কোনও রোগে যত দিন জীবাণুনাশক দেওয়ার কথা, তার চাইতে কম দিন, বা তার চাইতে কম মাত্রায়, জীবাণুনাশক দেওয়া চলবে না। রোগলক্ষণ কমে গেছে বলেই জীবাণুনাশক বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয়।

> সাধারণ ও সামান্য সংক্রমণে ওষুধের দোকান থেকে জীবাণুনাশক কিনে ব্যবহার করার প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার।

জীবাণু-সংক্রমণ ঠেকাতে জীবাণুনাশকের ব্যবহার

এমনটা করা হয় অপারেশনের আগে, কখনও কখনও দাঁত তোলার আগে। এ সব ক্ষেত্রে—

- কোন্ জীবাণু দিয়ে সংক্রমণ হতে পারে সে সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তিতে জীবাণুনাশক নির্বাচন করতে হয়।
- যত কম দিন ব্যবহার করা যায় তত ভাল। অপারেশনের সময় জীবাণু সংক্রমণ ঠেকাতে অপারেশন চলাকালীন জীবাণুনাশকের মাত্র একটা মাত্রা দেওয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। যদি বেশি দিন জীবাণুনাশক দিলে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে লাভ হবে এমন প্রমাণ থাকে তা হলে অবশ্য বেশি দিন ব্যবহার করা যায়।

জীবাণুনাশক-প্রতিরোধী (অ্যান্টিবায়োটিক-রেজিস্ট্যান্ট) জীবাণুর সমস্যা আজ সারা বিশ্বের সমস্যা। নানা দেশ নানা ভাবে এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী। আমাদের দেশে তেমন কোনও কার্যকরী উদ্যোগ চোখে পড়ে না--- না সরকারের দিক থেকে, না ডাক্তারদের পেশাগত সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে।

ডাক্তারদের জীবাণুনাশকের ব্যবহার সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ শিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার, বিভিন্ন জীবাণুসংক্রমণে আদর্শ চিকিৎসা নির্দেশিকা (standard treatment guidelines) কী হবে সেগুলো তৈরি করা দরকার, আদর্শ চিকিৎসা নির্দেশিকা মানা হচ্ছে কি না তার নজরদারি করার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পাশাপাশি চাই জনসাধারণের সচেতনতা। বিপদের স্বরূপ তাঁদের বোঝা দরকার। সাধারণ ও সামান্য সংক্রমণে ওষুধের দোকান থেকে জীবাণুনাশক কিনে ব্যবহার করার প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার। চিকিৎসকের নির্দেশমতো যথাযথ মাত্রায়, যথাযথ সময় ধরে জীবাণুনাশক ব্যবহার করা দরকার...।

দরকার জীবাণুনাশক ব্যবহার সম্পর্কে চিকিৎসক সমাজে ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সার্বিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার।

লেখক পরিচিতি : ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, হাওড়ায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে তোলা এক ক্লিনিকে পূর্ণ সময়ের চিকিৎসক ও *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র সম্পাদক।

Advt.

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহন ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজ্‌নে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ,

ফোন : ৯৮৩০৯২২১৯৪

উৎপল মণ্ডল, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন : ৯০৮৮০৫০৫২৫

অ্যাস্পিরিন

এক সময় ব্যথা কমাতে খুব ব্যবহার করা হতো, এখন বেশি ব্যবহার করা হয় করোনারী ধমনীর রোগে হার্ট অ্যাটাক আটকাতে, মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে সেরিব্রাল স্ট্রোক হওয়ার পর আবার স্ট্রোক হওয়া আটকাতে। ব্যবহার করাহয় রিউমাটিক জ্বরে গাঁটে ব্যথা-ফোলা-জ্বর কমাতে। ওষুধটার রাসায়নিক নাম অ্যাসিটিল স্যালিসিলিক এসিড, জেনেরিক নাম (ঠিক ভাবে বলতে গেলে অন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম) অ্যাস্পিরিন, বাজারে পাওয়া যায় ASA, Mazoral, Cv Sprin, Tinysprin, Cotasprin, Otapsrin, Sprintas, Ecosprin ইত্যাদি নামে।

যে রাসায়নিকগুলো থেকে আমাদের শরীরে প্রদাহ (inflammation) ব্যথা, ফোলা হয়, অ্যাস্পিরিন সেগুলোর পরিমাণ কমায়। মস্তিষ্কের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রকে প্রভাবিত করে জ্বর কমায়, তাছাড়া অ্যাস্পিরিন খেলে ঘাম হয়, তা থেকেও জ্বর কমে। এছাড়া অ্যাস্পিরিনের বড় গুণ বা দোষ— সে রক্তে অণুচক্রিকা বা প্লেটলেটের জমাট বাধা আটকায়, ফলে রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাধতে পারে না।

> ১২ বছরের কমবয়সীদের অ্যাস্পিরিন না দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

অ্যাস্পিরিন বড়ি আকারে পাওয়া যায় বিভিন্ন শক্তিকে— ৫০, ৬০, ৭৫, ৮০, ৮১, ৮২, ১০০, ১৫০, ১৬২.৫, ৩০০, ৩২৫, ৪০০ এবং ৫০০ মিলিগ্রাম শক্তির বড়ি তৈরি করে বিভিন্ন কোম্পানি। এন্টেরিক কোটিং বলে একটা আস্তরণ থাকে কোনও কোনও বড়িতে যাতে পাকস্থলীতে অ্যাস্পিরিন ঘা তৈরি না করে।

প্রাপ্তবয়স্কেরা জ্বর বা ব্যথা কমাতে অ্যাস্পিরিনের ৩০০ মিলিগ্রামের ১টা বা ২টো বড়ি প্রয়োজন মতো বা ৪ ঘণ্টা ছাড়া খেতে পারেন। ১২ বছরের কমবয়সীদের অ্যাস্পিরিন না দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা জ্বর কমাতে অ্যাস্পিরিন না নিয়ে অনেক নিরাপদ প্যারাসিটামলই ব্যবহার করতে বলব। প্রদাহ অর্থাৎ ব্যথা ও ফোলা কমানোর অনেক নিরাপদ ওষুধ আইব্রুপ্রোফেন।

করোনারী ধমনীর রোগে প্রতিদিন ৭৫ মিলিগ্রাম অ্যাস্পিরিন খেতে হয়। মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাধার পর প্রতিদিন ১৫০ মিলিগ্রাম করে। মস্তিষ্কের রক্তনালি থেকে রক্তক্ষরণ হওয়ার পর কিন্তু অ্যাস্পিরিন দেওয়া যায় না, তাতে আরও রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়ে। রিউমাটিক জ্বরে অ্যাস্পিরিন দিতে হয় অনেক বেশি মাত্রায়— প্রতি কিলোগ্রাম শরীরের ওজনের জন্য ৬৫ থেকে ১৩০ মিলিগ্রাম করে।

অ্যাস্পিরিন খেতে হয় খাবারের সঙ্গে বা খাওয়ার পর। জল প্রচুর খেতে হয়। এন্টেরিক কোটেড বড়ি হলে তা টুকরো বা গুঁড়ো করা যাবে না। তা হলে এন্টেরিক কোটিং অর্থহীন হয়ে যাবে।

অ্যাস্পিরিন চলছে এমন রোগী মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে ফেললে অস্বস্তি, পেটে ব্যথা, কানে ঝিঁঝিঁ আওয়াজ, দেখতে অসুবিধা, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি বা বমি হতে পারে। এমন কিছু হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

লিভার বা কিডনির সমস্যা, হাঁপানি, পেপটিক আলসার, নাকে পলিপ (যা থেকে রক্ত পড়তে পারে), গেঁটে বাত (gout), থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অতি সক্রিয়তা, রক্তাল্পতা, রক্ত জমাট বাঁধার অসুখ ইত্যাদি থাকলে ডাক্তার অ্যাস্পিরিন লেখার সময় বলুন। যদি কোনও অপারেশন হওয়ার থাকে, তাও জানান কেন না অ্যাসপিরিন চললেও তারপর কিছু দিন অপারেশনের সময় রক্ত বন্ধ করতে বেগ পেতে হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় অ্যাস্পিরিন ব্যবহার করা যাবে না। মায়ের দুধের সঙ্গে শিশুর শরীরে অ্যাস্পিরিন যায়, তবে স্বাভাবিক মাত্রায় বাচ্চার কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

শিশুদের রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা রিউমাটিক জ্বর ছাড়া অন্য জায়গায় ১২ বছরের নীচে অ্যাস্পিরিন দেওয়া যাবে না।

৬০ বছর বয়সেরও ওপরে অ্যাস্পিরিন থেকে পাকস্থলীতে রক্ত-ক্ষরণ ও রক্তাল্পতার ঝুঁকি বাড়ে। সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করুন।

যাঁদের অ্যাস্পিরিন চলছে তাঁদের মদ না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়— তাতে পাকস্থলীতে ঘা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

অ্যাস্পিরিনের সব চেয়ে বেশি যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা হল — বমি ভাব ও বমি। এই সমস্যা বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। পেটে অস্বস্তি, হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্ট, রক্তাল্পতা, আলসার ইত্যাদি হলে ডাক্তারের কাছে যেতে দেরি করবেন না।

এক সঙ্গে ব্যবহার করলে অ্যাস্পিরিন প্রোপানোলল, এটেনোলল-এর মতো বিটা-ব্লকারগুলোর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বাড়িয়ে দেয় মুখে খাওয়ার ডায়াবেটিসের ওষুধগুলোর কর্মক্ষমতা। ভিটামিন সি-র সঙ্গে খেলে অ্যাস্পিরিনের ক্রিয়া বাড়ে, বিষক্রিয়া হওয়ার ঝুঁকি থাকে। অ্যান্টাসিড, কর্টিকোস্টেরয়েড, মূত্রকে ক্ষারীয় করার ওষুধ ইত্যাদি অ্যাস্পিরিনের ক্রিয়াকে কমিয়ে দেয়। কর্টিকোস্টেরয়েডের সঙ্গে ব্যবহার করলে পাকস্থলীতে ঘা হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। যখন অ্যাস্পিরিন ব্যবহার করবেন, তখন এ কথাগুলো জেনে রাখা ভাল নয় কি?

সূত্র : *A Lay Person's Guide to Medicines What is in them and what is behind them,* LOCOST, Vadodara, 2006

সংকলন করেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দিন।
সবরকম যোগাযোগের জন্যে : ৯৮৩০৯ ২২১৯৪, ৯৩৩১০ ১২৫৩৫

নবজাতকের খাদ্য খাবার

অষ্টম পাঠ

কর্তব্যরত মায়েদের সমস্যা ও স্তন্যদুগ্ধের বিকল্প খাবার

আমরা এত দিনের আলোচনায় দেখেছি স্তন্যদুগ্ধই শিশুর সেরা খাবার। কিন্তু কখনও কখনও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন মা তার শিশুর কাছে সব সময় থাকতে পারেন না, যেমন কর্মরত মায়েরা। তাঁদের মাতৃত্বজনিত ছুটি শেষ হলেই তাঁকে কাজে যোগ দিতে হয়। আবার পরিস্থিতি এমনও হতে পারে মায়ের কোনও অসুখ বা ওষুধের জন্য তিনি শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে পারেন না। তখন স্তন্যদুগ্ধের বিকল্প খাবার শিশুকে দিতে হয়। এবার কর্মরত মায়েদের নিয়ে, যাঁরা তাঁদের শিশু স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে চান, তাঁদের সমস্যা নিয়ে লিখছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস।**

কর্মরত মায়েরা কী ভাবে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন?

যে সব মায়েরা বাইরে কাজ করেন, তাদের ক্ষেত্রে মাতৃত্বজনিত ছুটির পরে (Maternal leave) শিশুকে স্তন্য পান করানো অবশ্যই একটা বড় সমস্যা, বিশেষত আমাদের দেশে, যেখানে কর্মস্থলে শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থা প্রায় নেই। তবে স্বদিচ্ছা থাকলে অনেক মা-ই তার শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে পারেন। কী ভাবে তা সম্ভব, পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। মা কিছু বিকল্প সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখতে পারেন।

১। সম্ভব হলে মা বাড়িতে বসে কাজ করবেন।

২। সম্ভব হলে মা শিশুকে তার কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাতে পারেন।

৩। পাম্প করে বুকের দুধ বের করে সেই দুধ শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে।

৪। মা যখন বাড়িতে থাকবেন, তখন স্তন্য পান করাবেন, অন্য সময় বাইরের দুধ দিতে হবে।

সব ধরনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে যতটা সম্ভব শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে হবে। মা যখন শিশুর কাছে থাকবেন না, অফিসে থাকবেন, তখন অফিসে বসেই স্তন্যদুগ্ধ বার করে সম্ভব হলে লোক দিয়ে আনিয়ে শিশুকে খাওয়াতে হবে, অথবা দুধ ফ্রিজে রেখে দিয়ে পরে সেই দুধ শিশুকে খাওয়াতে হবে।

বুকের দুধ বার করে শিশুকে সেই দুধ কী ভাবে খাওয়ানো যায়, তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক।

স্তন্যদুগ্ধ বার করে (Expressed breast milk) শিশুকে খাওয়ানো :

শুধুমাত্র কর্মরত মায়েদেরই নয়, আরও অন্য কারণেও শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ বার করে খাওয়ানোর প্রয়োজন হয়। অনেক শিশু অনেক কারণে টেনে খেতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে মা চান না তার শিশু স্তনে মুখ দিয়ে টানুক, তিনি বোতলে দুধ খাওয়াতে পছন্দ করেন। এ রকম বিভিন্ন কারণেও দুধ বার করে খাওয়ানোর দরকার হতে পারে।

শিশুর জন্মের ১ সপ্তাহ পরে যখন স্তনে দুধ আসে, তখন প্রতিদিন মা ৩০০-৫০০ মিলিলিটার দুধ বার করতে পারেন। দিনদিন দুধের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তিন সপ্তাহ পরে এই পরিমাণ হতে পারে ৬০০-৭০০ মিলিলিটার।

স্তন্যদুগ্ধ বার করার পদ্ধতি :

তিন ভাবে এই দুধ বার করা যায়।

১। হাতের সাহায্যে :

হাতের সাহায্যে স্তন্যদুগ্ধ বের করতে গেলে দুধ বার করার পদ্ধতি জেনে অবশ্যই আগে অনুশীলন করে নিলে ভাল হয়। এজন্য অভিজ্ঞ কোনও সাহায্যকারীর, ডাক্তারের বা নার্সের পরামর্শ গ্রহণ করা ভাল। তবু সম্পূর্ণ পদ্ধতিটা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

- প্রথমে ভাল করে সাবান দিয়ে দুই হাত ধুতে হবে।
- দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে 'শিশুকে দুধ খাওয়াবো' এই ভাবনা আনতে হবে। শিশুর কোনও ছবি সামনে রাখলে ভাল হয়, এতে তাড়াতাড়ি ও সহজে দুধ আসে। 'লেট ডাউন' সহজে হয়।
- স্তনের ওপর হাত রেখে স্তন হাল্কা করে বাইরের দিক থেকে স্তন বৃন্তের দিকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করতে হবে।
- এবার বুড়ো আঙুল ও অন্য আঙুল দিয়ে স্তনবৃন্তের দু'পাশে রেখে হাল্কা ভাবে স্তনবৃন্ত বিস্তৃত করে ঘোরাতে হবে।
- তার পর বুড়ো আঙুল ওপরে ও তর্জনী নীচের দিকে অ্যারিওলার কালো অংশের বাইরের দিকে রাখতে হবে।
- এবার এই দুই আঙুলের সাহায্যে স্তনকে হাল্কা করে বুকের দিকে চেপে নিয়ে যেতে হবে।
- এরপর আঙুল দিয়ে স্তনবৃন্তকে সামনের দিকে চাপতে হবে দুধ

দোয়ানোর মতো করে। দুধ তখন ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

- বার বার এই পদ্ধতিতে দুই স্তন থেকেই দুধ বার করতে হবে।
- প্রথম এক দু'ফোঁটা দুধ স্তনের ওপর ফেললে দুধ সহজে আসে। এক হাতে অসুবিধা হলে হাত পাল্টে নিতে হবে।

সব মিলিয়ে প্রতিবারে দুধ বার করতে ২০-৩০ মিনিট সময় লাগবে পরে। ৪-৫ মিনিট করে প্রতি স্তনে যদি তিনবার করে দুধ বার করা হয়, তবে ২৫-৩০ মিনিট সময় লাগবে। এরকমই লাগা উচিত। এই সময়টা মাকে ধৈর্য ধরে এই কাজে ব্যয় করতে হবে।

২। হাত পাম্পের সাহায্যে :

অনেক মা-ই হাত দিয়ে দুধ বের করতে চান না। তারা দু' রকমের পাম্প ব্যবহার করে দুধ বার করতে পারেন। হাত-পাম্প এবং ইলেকট্রিক পাম্প। পাম্প স্তনে লাগিয়ে ভ্যাকুয়াম প্রেসার তৈরি করলে আপনা থেকেই দুধ বেরিয়ে আসে। সেই দুধ পাম্পের সঙ্গে লাগানো পাত্রে জমা হয়। সেখানে থাকে দুধকে সংগ্রহ পাত্রে রাখা হয়। যে পাম্পই ব্যবহার করা হোক না কেন, স্তনে সম্পূর্ণ দুধ আসার আগে কোনও পাম্প স্তনে লাগানো উচিত নয়। আর স্তনে দুধ আসার জন্যে স্তন ম্যাসাজের প্রয়োজন।

হাত-পাম্প ব্যবহার করে দুধ বের করার পদ্ধতি :

- প্রথমে হাতের সাহায্যে স্তনকে ম্যাসাজ করে উত্তেজিত করে 'লেট ডাউন রিফ্লেক্স' কে কার্যকরী করতে হবে। তার পর স্তনে যখন দুধ আসবে, তখন পাম্প ব্যবহার করতে হবে।
- পাম্পের মুখটা সরাসরি স্তন বৃন্তের ওপর চেপে বসাতে হবে।
- বার বার রাবারের অংশটা চেপে ভ্যাকুয়াম তৈরি করে দুধ বের করতে হবে, সেই দুধ পাম্পের সঙ্গে লাগানো পাত্রে জমাবে। বার বার পাম্প করে একটা স্তনের পুরো দুধই বার করে নিতে হবে। স্তনে জমা শেষ বিন্দু দুধও শিশুর প্রয়োজন, কারণ শেষের দুধের পুষ্টিগুণ বা উপকার বেশি। এ প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।
- এমন ভাবে পাম্প ব্যবহার করতে হবে, যেন স্তনের বা স্তন বৃন্তের ওপর কোনও চাপ না পড়ে। স্তন বৃন্তে চাপ পড়লে বা crack হলে বা ফেটে গেলে ব্যথা হবে, দুধ বার করতে অসুবিধা হবে।

> অনেক মা-ই হাত দিয়ে দুধ বের করতে চান না। তারা দু' রকমের পাম্প ব্যবহার করে দুধ বার করতে পারেন

৩। ইলেকট্রিক পাম্পের সাহায্যে :

হাত পাম্প ছাড়া ইলেকট্রিক পাম্পও পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও প্রথমে হাতের সাহায্যে স্তন ম্যাসাজ করে 'লেট ডাউন' রিফ্লেক্সকে কার্যকরী করে তার পর পাম্পের সাহায্যে দুধ বার করতে হবে। প্রথমে হালকা চাপে, পরে ধীরে ধীরে পাম্পের চাপ বাড়িয়ে ঠিক করে নিতে হবে। স্তনের শেষের দুধ সাধারণত হাত দিয়ে চেপে বার করতে হয়।

মনে রাখতে হবে :

- তিন বা চার ঘণ্টা পরে পরে বা বুকে বেশি দুধ জমে যাওয়ার আগেই দুধ বার করে নিতে হবে। সাধারণত যে সব মায়েরা অফিস করেন, আট ঘণ্টায় তাদের তিন বার দুধ বার করার প্রয়োজন হয়।
- শিশুকে স্বাভাবিক অবস্থায় যতবার দুধ খাওয়ানো হবে, ততবারই প্রয়োজনে দুধ বার করতে হবে।
- বেশি দুধের দরকার হলে বেশিবার দুধ বার করতে হবে।
- রাত্রেও অন্তত একবার দুধ বার করা দরকার, তাতে দুধের যোগান ঠিক থাকে।
- বার করা দুধ বোতলে এবং বাটি চামচে খাওয়ানো যায়। মায়ের যেটা পছন্দ।

বার করা দুধ সংরক্ষণ :

- শিশুকে যথা সম্ভব টাটকা দুধ খাওয়াতে হবে। কিন্তু অনেক সময় শিশু সম্পূর্ণ দুধ খেতে পারে না, তখন বাকি দুধ সংরক্ষণ করা দরকার। এ ছাড়া মা যখন অন্যত্র থাকেন, তখনও দুধ সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়।
- পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত কাঁচের বা প্লাস্টিকের পাত্রে দুধ রাখা যেতে পারে। তবে প্লাস্টিকের পাত্রই ভাল।
- প্রতিটা পাত্রে লিখে রাখতে হবে কখন দুধ বার করা হল।
- বার করার এক ঘণ্টার মধ্যে দুধ সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজে রাখতে হবে।
- ফ্রিজের পেছনে সবচেয়ে ঠান্ডা অংশে (তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে) রাখতে হবে, তবে যেখানে বরফ জমে সেখানে (deep freeze-এ) সাধারণত রাখা হয় না।
- সংরক্ষিত দুধ কত দিন ঠিক থাকবে, তা নির্ভর করে কী ভাবে দুধ সংরক্ষণ করা হবে তার ওপর।
  - ---- ঘরের তাপমাত্রায় দুধ ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ঠিক থাকে।
  - ---- ফ্রিজের মধ্যে শীতপ্রধান দেশে চার ডিগ্রি তাপমাত্রার নীচে রাখলে দুধ ৪/৫ দিন ঠিক থাকে। কিন্তু গরমের দেশে বার বার ফ্রিজ খোলা হয়, তাই দুধ ২৪ ঘণ্টার বেশি রাখা উচিত নয়।
  - ---- থার্মোকলের বাক্সের মধ্যে বরফ দিয়ে রাখলে বা আইস ব্যাগে বরফের মধ্যে রাখলে দুধ ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ঠিক থাকে।
  - ---- সাধারণ এক পাল্লার ফ্রিজে ফ্রিজারের মধ্যে দুধ জমিয়ে রাখলে দু' সপ্তাহ পর্যন্ত ঠিক থাকতে পারে।
  - ---- আলাদা ফ্রিজারে রাখলে তিন মাস পর্যন্ত ঠিক থাকে। তবে গরমের সময় এত দিন রাখা উচিত নয়।
  - ---- আর মাইনাস (-) ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচের তাপমাত্রার ফ্রিজে রাখলে ৬ মাস দুধ ঠিক থাকে।
  - ---- ফ্রিজে প্লাস্টিকের বোতলে দুধ রাখা ভাল। আর সব সময়ই ঢেকে বা বোতলের মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে।

সংরক্ষিত দুধ খাওয়ানোর আগে :

- খাওয়ানোর আগে জমা দুধকে তরল করে স্বাভাবিক তাপমাত্রার করে নিতে হয়। ফ্রিজারে খুব ঠান্ডায় সংরক্ষিত থাকলে সেই দুধ বার করে ফ্রিজে কম তাপ মাত্রায় ঢুকিয়ে ২৪ ঘণ্টা ধরে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমিয়ে তরল করতে হয়।
- অন্য ভাবেও তরল করা যায়। প্রথমে দুধের পাত্রের ওপর ঠান্ডা জল ঢালতে হবে। জলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে জমা দুধ তরল করা যায়।
- দুধ কখনওই কিন্তু বেশি গরম করা ঠিক নয়, এতে দুধের পুষ্টিগুণ কমে যায়।
- কখনওই মাইক্রো ওভেনে দুধ গরম করা উচিত নয়।
- জমা দুধকে ফ্রিজে রেখে তরল করলে সেই দুধ ফ্রিজে চব্বিশ ঘণ্টা ও ঘরের তাপমাত্রায় চার ঘণ্টা পর্যন্ত রাখা যায় তারপর আর তাকে জমানো উচিত নয়।
- যদি বাইরে জল ঢেলে দুধ তরল করা হয়, তবে সেই দুধও চার ঘণ্টা পর্যন্ত রাখা যায়। তাকেও আর ফ্রিজে রেখে জমানো উচিত নয়।

পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত কাঁচের বা প্লাস্টিকের পাত্রে দুধ রাখা যেতে পারে।

মোট কথা, মা যদি ইচ্ছা করেন এবং অফিসে দুধ জমানোর কোনও রেফ্রিজারেটর থাকে, তবে মায়ের দুধ শিশুকে খাওয়ানো খুব কঠিন নয়। মা একটা প্লাস্টিকের পাত্র নিয়ে অফিসে যাবেন। কলিগ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আগেই অবহিত করে নেবেন যে তিনি নিয়মিত স্তন্যদুগ্ধ বার করবেন। আশা করা যায় সবাই তাকে সহযোগিতাই করবেন এবং তিনি এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত-স্বরূপও হতে পারেন। বার করা দুধ আর একটা প্লাস্টিকে মুড়ে নাম ও সময় লিখে ফ্রিজে রেখে দেবেন। ফেরার সময় একটা আইসব্যাগে করে দুধ বাড়িতে এনে শিশুকে খাওয়াবেন। কষ্ট হয়তো একটু হবে, কিন্তু শিশুর স্বাস্থ্য এবং আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য এটুকু কষ্ট মা স্বীকার করে নেবেন বলেই আমাদের আশা।

স্তন্যদুগ্ধের বিকল্প খাবার :

আগেই আমরা বারবার বলেছি মায়ের দুধের কোনও বিকল্প নেই। এখনও তাই বলছি, এও বলছি মায়ের দুধের বিকল্প মায়েরই দুধ। অন্য মায়ের দুধও হতে পারে। তাই সম্পূরক খাদ্য হিসাবে নবজাতককে দেওয়া যেতে পারে।

১। মা অন্যত্র থাকলে শিশুকে তার নিজের মায়ের দুধ বার করে এনে খাওয়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

২। নিজের মায়ের দুধ না পেলে অন্য মায়ের দুধও খাওয়ানো যাবে।

৩। কোনও স্তন্যদুগ্ধ না পেলে অগত্যা গুঁড়ো দুধ বা কৌটোর দুধ বা ফর্মুলা দুধ দিতে হবে। জল বা গ্লুকোজের জল খাওয়ানো উচিত নয়। কৌটোর দুধ বা গুঁড়ো দুধ বিভিন্ন রকমের হয়। শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাভাবিক দুধ, সয়াবিনের দুধ বা প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট গুঁড়ো দুধ দেওয়া যেতে পারে।

কোন্ অবস্থায় শিশুকে বাইরের খাবার দিতে হয়, কতটা দিতে হয়, তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক।

ছয় মাসের আগে স্তন্যদুগ্ধের পরিবর্তে অন্য খাবার দেওয়া হলে তাকে বলে সম্পূরক খাবার বা ইংরেজিতে supplimentary food। আর ছয় মাসের পর স্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে যে খাবার দিতে হয় তাকে বলে পরিপূরক খাবার বা complementary food। ছয় মাসের পর শিশুকে কী খাবার দেওয়া উচিত তা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, আপাতত আলোচনার বিষয় সম্পূরক খাবার নিয়ে। তার আগে জানা উচিত কোন্ কোন্ শিশুর সম্পূরক খাবারের প্রয়োজন আছে।

সুস্থ সবল শিশুকে যে অবস্থায় সম্পূরক বা বিকল্প খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয় :

১। যদি শিশুর রক্তে সুগার বা গ্লুকোজের মাত্রা কমে যায় এবং বার বার বুকের দুধ খাইয়েও সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক করা না যায়।

২। শিশুর কিছু জন্মগত বিপাকীয় ত্রুটি থাকতে পারে, যখন শিশু বুকের দুধ ঠিকমতো পরিপাক করতে পারে না। যেমন—

- শিশু যদি 'গ্যালাকটোসেমিয়া' রোগ নিয়ে জন্মায়।
- শিশু যদি 'ম্যাপেল সিরাপ ইউরিন' রোগ নিয়ে জন্মায়। এই অবস্থায় অ্যামাইনো অ্যাসিড লিউসাইন, আইসো লিউসাইন, ভ্যালিন মুক্ত খাবারের প্রয়োজন।
- শিশু যদি 'ফিনাইল কিটোনিউরিয়া' রোগ নিয়ে জন্মায়। এই অবস্থায় অ্যামাইনো অ্যাসিড ফিনাইল 'অ্যালানিন' মুক্ত খাবারের প্রয়োজন।

৩। শিশুর যদি এমন জন্মগত ত্রুটি থাকে যে শিশু বুকের দুধ টানতে পারে না, যেমন ঠোঁট বা তালু সম্পূর্ণ তৈরি না হওয়া ('left lip and cleft palate)।

৪। মায়ের বা শিশুর রোগ বা অন্য কারণে মাকে যদি শিশুর কাছ থেকে আলাদা থাকতে হয়।

৫। মা যদি এমন কোনও ওষুধ খান যে বুকের দুধ পান করালে শিশুর অসুবিধা হতে পারে।

৬। মা যদি এমন রোগে ভোগেন, যে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত নয়। যেমন—

- সেপসিস, সাইকোসিস বা অন্য মারাত্মক অসুখ।
- মায়ের যদি হারপিস সিমপ্লিক্স-১ ভাইরাস সংক্রমণের অসুখ হয়।
- মা যদি HIV বা এইডস-এ ভোগেন। এক্ষেত্রেও অনেক সময় মায়ের দুধ দেওয়া যেতে পারে।
- মায়ের যদি HTLV ভাইরাস সংক্রমণের অসুখ হয়।
- মা যদি মানসিক রোগের বা এপিলেপসি জাতীয় রোগের ওষুধ খান।
- মাকে যদি রেডিও অ্যাকটিভ আয়োডিন-১৩১ কোনও কারণে ব্যবহার করতে হয়।
- মাকে যদি ক্যানসারের জন্য ওষুধ খেতে হয়।

যে অবস্থায় শিশুকে সাময়িক ভাবে বিকল্প খাবার দুধের প্রয়োজন হতে পারে

১। যদি শিশুর হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে— যেমন কম ওজনের শিশু, আগে জন্মানো শিশু, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মায়ের শিশু, যদি জন্মের সময় হাইপোক্সিয়া বা অন্য অসুবিধায় ভুগেছে এমন শিশু।

২। যদি কোনও কারণে শিশুর শরীরের জল খুব বেশি কমে যায় বা ডিহাইড্রেশান হয়।

৩। স্বাভাবিক অবস্থায় জন্মের পরে শিশুর শরীরের অতিরিক্ত জল কমে যায়, তার ফলে তার ওজন ৫.৫ থেকে ৬.৬ শতাংশ কমে যায়। ৯ দিন বয়সের মধ্যে আবার শিশু জন্মের ওজন ফিরে পায়। যদি কোনও শিশুর ওজন জন্মের ওজনের ৮-১০ শতাংশ কমে যায়, বা জন্মের ১০ দিনের মধ্যে আগের ওজন ফিরে না আসে তখন বাইরের খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

৪। শিশুর জন্ডিস হলে। জন্মের পরে অনেক শিশুই জন্ডিসে ভোগে। লিভারের অপরিপক্কতাই এর প্রধান কারণ। সেই জন্ডিস যদি এমন হয় যে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে বা খেতে চায় না, তখন বাইরের খাবারের দরকার হয়। আবার বুকের দুধের কারণেও এই জন্ডিস হতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুর রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা ২০ মিলিগ্রামের বেশি, (১০০ মিলিলিটারে) হলেই বুকের দুধের পরিবর্তে খাবার দেওয়া উচিত।

৫। যদি শিশুর ওজন কমতেই থাকে এবং ৫ দিন বা ১২০ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের স্তনে দুধ না আসে।

৬। কোনও জন্মগত ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও শিশু যদি ৫ দিন পরেও স্বাভাবিক মলত্যাগ না করে।

৭। আগে জন্মানো বা খুব ওজনের শিশুর ক্ষেত্রে।

৮। শিশুর ওজন যদি ঠিকমতো না বাড়ে (শিশুর ওজন প্রথম ২-৪ মাসে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১১৫ গ্রাম বাড়া উচিত, ৪-৫ মাসে ৮৫ গ্রাম প্রতি সপ্তাহে এবং ৬-১২ মাসে ৬০ গ্রাম প্রতি সপ্তাহে বাড়া উচিত।)

মায়ের যে সকল শারীরিক কারণ উদ্বেগজনক কিন্তু তবুও বুকের দুধ খাওয়ানো যেতে পারে :

- **স্তনে ফোঁড়া :** যে স্তন ভাল, সেই স্তন থেকে শিশুকে দুধ খাওয়ানো যায়।
- **হেপাটাইটিস-বি :** দুধ খাওয়ানো যাবে, কিন্তু শিশুকে জন্মের পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হেপাটাইটিস-বি টিকা দিতে হবে।
- **স্তন প্রদাহ বা ম্যাস্টাইটিস :** যদি স্তনে খুব ব্যথা না হয় তবে শিশু সরাসরি স্তন পান করবে। বেশি ব্যথা হলে দুধ বার করে খাওয়াতে হবে।
- **মা যদি নেশা করেন :** মা যদি নারকোটিকস, অ্যালকোহল, নিকোটিন, কোকেন, ইত্যাদি নেশা করেন, তবে শিশুর ক্ষতি হয় ও নানা রকম উপসর্গ দেখা দেয়। মা এগুলো থেকে বিরত থাকলে স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে পারেন।

এর পরের সংখ্যায় আমরা আলোচনা করব স্তন্যদুগ্ধের বিকল্প খাবার নিয়ে।

লেখক পরিচিতি : ডা. স্বপন বিশ্বাস, ডিসিএইচ, এমডি, শিশু বিশেষজ্ঞ। সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

পড়ুন ও পড়ান।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র। advt.

একটি মৃত্যুর ময়নাতদন্ত

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র গত অগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪-র একটা লেখায় আমরা জেনেছি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ, যেখানে বিষধর সাপের সংখ্যা নির্বিষ ও স্বল্প বিষ সাপের চেয়ে তুলনামূলক বেশি, সেখানে গত ৭ বছরে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে নয় জন মানুষের। অন্য দিকে, আমাদের দেশে Million Death Study নামের সমীক্ষায় Registrar General of India এর মতে সর্পাঘাতে মৃত্যুর বাৎসরিক সংখ্যা প্রায় ৪৫,৯০০! আর আমরা যারা মাঠে ঘাটে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারের সামান্যতম প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত আছি, তারা মনে করি এই সংখ্যাও সঠিক নয়। এই সংখ্যা আরও অনেক ভয়ঙ্কর ভাবে বেশি!

> সর্পদংশনে আক্রান্ত মানুষকে চিকিৎসার প্রথম পাঠই হল, আক্রান্ত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করুন

এক কথায় সর্পদংশনে মৃত্যু একটা অবহেলিত গ্রামীণ সমস্যা! আরও অনেক সমস্যার মতো এই সমস্যাতেও আমাদের কী করা উচিত কী নয় তা ভাবার সময় এসেছে। সেই ভাবনাই আজ আমরা ভাবব। তার আগে আসুন বিখ্যাত শহর বিষ্ণুপুরের এক অখ্যাত দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক রমণী মালতী লোহারের সঙ্গে কী হয়েছিল একটু জানার চেষ্টা করি।

০৪.০৮.২০১৪ বিকেল বেলা :

ফোন এলো গোরাচাঁদ রাণার কাছ থেকে। বিষ্ণুপুর এস. আই. অফিসে অনুষ্ঠিত 'সাপ—কুসংস্কার বনাম বিজ্ঞান' নামের এক স্লাইড শো-এ আমাদের এই নতুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ।

---- হ্যাঁ দাদা বলুন।

---- ভাই একটা খারাপ খবর। গত ২ তারিখে আমাদের পাশের বাড়ির এক জন সাপের কামড়ে মারা গেলেন!

---- সে কি! হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়নি?

---- আরে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। রাতে যখন কামড়ায় তখন আমি সবে খেতে বসেছি। হইচই শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি ওঁকে নিয়ে হাসপাতাল চলে গেছে। নিশ্চিন্ত ছিলাম। যাক দেরি করেনি। কিন্তু পরে শুনলাম মারা গেছেন। কয়েক দিন আগেই ওঁদের সঙ্গে আলোচনা সূত্রে বলেছিলাম, বুঝিয়েছিলাম, সাপে কামড়ালে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল যাওয়ার কথা। আর তাই করেছেন ওঁরা। কিন্তু এ কী হল বলুন তো?

দুঃখে কষ্টে ভারী হয়ে এল মনটা। ঘটনা সরেজমিনে খতিয়ে দেখবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা।

০৬.০৮.২০১৪ বিকেল ৫টা, মালতী লোহারের বাড়ি :

ওখানে গিয়ে আমরা যা জানতে পারলাম তা সংক্ষেপে এই রকম।

মালতী দেবীদের দু-কুঠুরির টিনের বাড়ি। তার সামনের ছোট্ট বারান্দার মাঝে একটাই দরজা, যা পেরোলেই ফাঁকা উঠোন। ওটিই ঘরের মূল প্রবেশ পথ। উঠোন মোটামুটি পরিষ্কার। দরজার ঠিক ওপরেই জ্বলছে একটা সি.এফ.এল.। এই দরজার পাশেই মালতীদেবী বসে ছিলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে ন'টা। হঠাতই একটা ইঁদুরের পিছন ধাওয়া করতে করতে একটা কেউটে সাপ ওঁর কাছে চলে আসে ও পেটে ও হাতে কামড় দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোক সাপটাকে মারেন ও পাশের বাড়ির এক জনের সহায়তায় মোটরসাইকেলে করে এক কিলোমিটারের মধ্যে থাকা বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখানে এমার্জেন্সিতে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভদ্রমহিলাকে দেখে যা বলেন তার মর্মার্থ— রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং বাঁচানো মুশকিল। এবং এই কথোপকথন মালতীদেবীর সামনেই চলে। পরিজনেরা সকলেই খেয়াল করেন ডাক্তারের মুখ থেকে এ কথা শুনে আতঙ্কিত ও যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা মালতীদেবী কেমন যেন হয়ে যান!

শ্রদ্ধেয় পাঠকমণ্ডলী, খেয়াল রাখুন সর্পদংশনে আক্রান্ত মানুষকে চিকিৎসার প্রথম পাঠই হল, আক্রান্ত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করুন। ওঁর মনোবল বাড়ান। কারণ, তিনি অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে আছেন। (Reassure the victim who may be very anxious. Guidelines for the management of snake bites, David A Warrell, SEARO, WHO, 2010)। সকলে চিকিৎসককে বলেন মৃত কেউটে সাপটা ওঁরা এনেছেন। তা শুনেই চিকিৎসক আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ও সাপের প্রতি ওঁর ভয়ঙ্কর ভীতির কথা প্রকাশ করেন। পরে, সাপটা যে মৃত তা নিশ্চিত হয়েই সাপটা দেখেন।

এদিকে মালতী দেবীকে ইন্ডোরে ভর্তি করা হলে চিকিৎসক ওঁকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে রেফার করেন। এমার্জেন্সিতে আনা থেকে শুরু করে ইন্ডোরে নিয়ে যাওয়া, সেখানে চিকিৎসা শুরু হওয়া, ওষুধ কেনা, রেফার করা, গাড়িতে তোলা এই সব করতে করতে প্রায় ঘণ্টা খানেক অতিক্রান্ত। গাড়িতে তোলার সময় ওঁদের অন্য রকম মনে হওয়ায় ইমার্জেন্সির ডিউটি সেরে বেরিয়ে যাওয়া চিকিৎসককে (যিনি ভদ্রমহিলাকে আশ্বস্ত করার বদলে আতঙ্কিত করে তোলেন) অনুরোধ করেন মালতী দেবীকে দেখতে। কারণ যদি ''অন্য কিছুই' ঘটেই থাকে তা হলে তো অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই বৃথা। ওঁদের অনুরোধে কর্ণপাত না করে তিনি এমার্জেন্সিতে থাকা চিকিৎসককে দেখাতে বলে রোগীর পাশ দিয়েই অন্য কাজে চলে যান। সেই কথামতো ওঁরা এমার্জেন্সিতে থাকা চিকিৎসককে অনুরোধ করলে তিনি রোগীকে ওঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেন। এমার্জেন্সির কক্ষ থেকে অ্যাম্বুল্যান্সের দূরত্ব বড়জোর ২৫ মিটার। তা শুনে একজন অনুযোগ করেন—ওই মৃতপ্রায় রোগীকে আনার কথা বলছেন! আপনিই চলুন একবার!

শুনে ডাক্তার গিয়ে দেখে বলেন— ''এখনও প্রাণ আছে ... দেখুন যদি তাড়াতাড়ি যেতে পারেন!''

প্রবল ইচ্ছায় বুক বেঁধে ওঁরা যাত্রা শুরু করেন ৫০ কিলোমিটার দূরের

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের দিকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ওঁরা বুঝতে পারেন, হয়তো সব শেষ! কিলোমিটার পাঁচেক যাওয়া ভাড়া গাড়ি ফিরিয়ে ওঁরা ফের ফিরে আসেন বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে।

প্রায় দুই ঘণ্টার লড়াই শেষে মালতীদেবী হার মানলেন মৃত্যুর কাছে! শেষ হয়ে গেল আমাদের দেশের প্রিয় সন্তান মালতী দেবীর জীবন। আচ্ছা, এটা কি নেহাতই হার মানা?

কথা বলতে বলতে আমরা হাতে পেলাম বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা কাগজ। এক ভয়ঙ্কর নথি যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কী মারাত্মক অপচিকিৎসার শিকার হলেন মালতী দেবী!

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা ওই কাগজে ফাইনাল ডায়াগনোসিস এর স্থানে লেখা ''কোবরা বাইট'' এবং অ্যাডভাইসের স্থানে লেখা আই. ভি. ফ্লুইড, ৫ এ.ভি.এস. এবং অন্য দুটো ইঞ্জেকশন। সুলভ মূল্যের দোকানের রসিদে তাদের নাম লেখা—প্রোমিথাজাইন ও হাইড্রোকর্টিসোন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ থাকলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে স্যালাইনের সঙ্গে ১০ ভায়াল এ.ভি.এস. দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং তা এক ঘণ্টার কম সময়ে রোগীর শরীরে প্রবেশ করাতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরের তৈরি ''স্নেক বাইট ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল'', যা প্রতিটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে টাঙানো থাকার কথা, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

- বিষধর সাপে কামড়ানো রোগী ভর্তি হলে ও বিষক্রিয়ার লক্ষণ থাকলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে স্যালাইনের সঙ্গে ১০ ভায়াল এ.ভি.এস. দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে এবং তা এক ঘণ্টার কম সময়ে রোগীর শরীরে প্রবেশ করাতে হবে।
- আর গোখরো বা কেউটে জাতীয় ফণাধর নিউরোটক্সিক সাপের ক্ষেত্রে নিওস্টিগমিন ও অ্যাট্রোপিন অবশ্যই দিতে হবে। আমরা অনেকেই জানি বিজ্ঞানকর্মী জয়দেব মণ্ডল কেউটের কামড়ে আক্রান্ত হলে ২২ ভায়াল এ.ভি.এস. পাওয়া সত্ত্বেও নিওস্টিগমিনের অভাবে (যা প্রতিটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকার কথা) আজ আমাদের মধ্যে নেই।
- এ.ভি.এস. চলাকালীন ডাক্তার রোগীর পাশে সর্বক্ষণ থাকবেন।
- আর একান্তই রেফার করতে হলে অবশ্যই ১০ ভায়াল এ.ভি.এস. না দিয়ে রেফার করা যাবে না।

অত্যন্ত দুঃখ আর হতাশার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম ওই নির্দেশিকার একটাও এক্ষেত্রে মানা হয়নি এবং আরও মর্মান্তিক ব্যাপার হল বিষ্ণুপুর হাসপাতালের দেওয়ালে ওই প্রোটোকলটা টাঙানোও নেই।

ওই দিনই আমরা সি.এম.ও. এইচ-এর সঙ্গে দেখা করতে ওঁর অফিসে যাই।

০৬.০৮.২০১৪ রাত্রি সাড়ে সাতটা, সি.এম.ও.এইচ অফিস, বিষ্ণুপুর : সকলে গিয়ে ওঁকে পুরো বিষয়টা জানালে উনি বলেন যে না দেখে কিছু বলবেন না। আর প্রোটোকলটা বিষ্ণুপুর হাসপাতালে টাঙানো নেই কেন জানতে চাইলে বলেন— আরে ওই রকম কত প্রোটোকলই ওঁদের কাছে আছে। টিবির প্রোটোকল-ডায়রিয়ার প্রোটোকল—কত আর টাঙাবেন ওঁরা!

ওই প্রোটোকলটা কর্তব্যরত চিকিৎসকের চোখের সামনে থাকলে হয়তো মালতী দেবীকে আমরা হারাতাম না! আমরা জেনেছি পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই এই প্রোটোকলটা টাঙানো নেই। দায়িত্বপ্রাপ্তেরা হয়তো এই মনোভাবই পোষণ করেন।

খেয়াল রাখুন সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে সময় কিন্তু এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গোখরো বা কেউটে সাপের কামড়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মাত্র ১০ মিনিট কথা বলা অবস্থায় পেলে তাঁকে সঠিক চিকিৎসায় একেবারে সুস্থ করে তোলা যায়।

সেদিনই আমরা সকলে মিলে বিষ্ণুপুর থানায় যাই এবং সেখানে মালতীদেবীর ছেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ দায়ের করেন, কিন্তু থানা অভিযোগ রিসিভ না করলে তা পরের দিন রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো হয়।

০৮.০৮.২০১৪ : আমরা, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির রাধানগর শাখার পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টাকে জানিয়ে ডাইরেক্টর অফ্ হেলথ সার্ভিসেস, পশ্চিমবঙ্গকে একটা অভিযোগ ফ্যাক্স মারফত জানাই। তার প্রতিলিপি পাঠানো হয় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে জেলাশাসক, এস.ডি.ও - বিষ্ণুপুর ও অন্যান্যদের।

মূল চারটে অভিযোগ হল :

১। সর্পদংশনে আক্রান্ত রোগীকে আশ্বস্ত না করে তাঁকে আরও আতঙ্কিত করে তোলা।

২। ১০ ভায়াল এ.ভি.এস.-এর পরিবর্তে ৫ ভায়াল এ.ভি.এস. দিয়ে রেফার করা।

৩। নিওস্টিগমিন ও অ্যাট্রোপিন না দিয়ে রেফার করা।

৪। বিষ্ণুপুর হাসপাতালে প্রোটোকলটা না টাঙানো।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়— হাসপাতালে মৃত সাপ আনা সত্ত্বেও, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা ওই কাগজে ফাইনাল ডায়াগনোসিসের স্থানে লেখা 'কোবরা বাইট' এবং অ্যাডভাইসের স্থানে '৫ এ.ভি.এস.' এর উল্লেখ থাকলেও মালতীদেবীর ময়নাতদন্তে মৃত্যুর কারণ হিসাবে লেখা হয়েছে 'অজানা কামড়'!

০৮.০৯.২০১৪ :

মৃত্যুর কারণ সাপের কামড় এই মর্মে একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য মালতীদেবীর ছেলে একটা আবেদন জানিয়েছেন বিষ্ণুপুর হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে। কারণ 'ডিস্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট' থেকে সাপে কামড়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রাপ্য এককালীন ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আর বাধ্যতামূলক নয়। মৃত্যুর কারণ যে সাপের কামড় তার উল্লেখ সমন্বিত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মৃত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদানকারী চিকিৎসকের দেওয়া শংসাপত্রই এখানে অধিক গ্রাহ্য বিষয়। (Order No.1561 (19) F.R./4P-3/04, Dated 19.08.2008 by Disaster Management Department, Writers's Buildings, Kolkata 700001। ১২.০৯.২০১০ : বিষ্ণুপুর হাসপাতালের

সুপারিনটেন্ডেনট 'মেডিক্যাল রিপোর্ট অফ মালতী লোহার' বলে লিখে দিলেন, ''ফাইনাল কজ অফ্ কেথ উইল বি শক্ ইন কেস অফ্ স্নেক বাইট...'' ইত্যাদি। অর্থাৎ সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে, এই কথাটা বলা হল।

এরপর বিষ্ণুপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে সব কাগজপত্র জমা দেওয়া হল। এখন অপেক্ষা করে সে সব কাগজ এস.ডি.ও. অফিসে যাবে। সেখান থেকেই মালতী লোহারের বাড়ির লোক এককালীন 'ক্ষতিপূরণ' পাবেন।

জেনে রাখুন, সানস্ট্রোক ও বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তির পরিবার ও উক্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

শেষের কথা :

মালতীদেবীর মৃত্যু ও তার কারণ এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ হয়তো আগামী প্রজন্ম খুঁটিয়ে দেখবে। হয়তো অবাক হয়ে তারা ভাববে যে একটা মানুষের অমূল্য জীবন যা কত সহজেই বাঁচানো যায় তাকে কত নির্লিপ্ত ভাবে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এরকম কত শত মালতী লোহার, আমাদের দেশের প্রিয়তম সন্তানেরা কত সহজেই শেষ হয়ে যান আমাদের সকলের অগোচরে। আর তাঁদের পরিজনেরা মেনে নেন অদৃষ্ট ভেবে! কারণ এটাই তাদের শেখানো হয়! আর আমরা যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওঝা-পীর ফকিরের থান থেকে উদ্ধার করে সাপে কামড়ানো রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাই বা যাওয়ার চেষ্টা করি, মানুষকে হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলি তাদের গুরুতর ভাবে ভাবার সময় এসেছে কী ভাবে এই সব কিছু বন্ধ করা যায়। আমাদের সকলের বুঝে নেওয়ার সময় এসেছে সাপে কাটা সমস্যা একটা অবহেলিত গ্রামীণ সমস্যা।

আমাদের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা এমন যে যেখানে এম.বি.বি.এস শিক্ষাক্রমেই এই সর্পদংশনের বিষয়টা সম্বন্ধে বিস্তারিত নেই।

তাই আসুন বন্ধুরা, সকলে একত্রিত হয়ে এই মৃত্যু মিছিলের গোড়ার কারণগুলোকে চিহ্নিত করি। সেই কারণগুলো হল, আমাদের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা এমন যে যেখানে এম.বি.বি.এস শিক্ষাক্রমেই এই সর্পদংশনের বিষয়টা সম্বন্ধে বিস্তারিত নেই। যেখানে গরিব, শিক্ষা-বঞ্চিত মানুষ, যাঁরা কোনওভাবেই কিছু বলেন না বা বলতে পারেন না তাঁদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা, হাসপাতালের চূড়ান্ত অব্যবস্থা, এক শ্রেণির কর্মী-চিকিৎসকদের রোগীদের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই যেন দস্তুর।

তাই আসুন সকলে আমরা সমবেত ভাবে বলি, সাপের কামড়ে আর একটাও মৃত্যুকে আমরা কোনওভাবেই মেনে নেব না। এ কাজ আমাদের করতেই হবে।

লেখক পরিচিতি : সৌম্য সেনগুপ্ত, বিজ্ঞানকর্মী।

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata-700 027,
Phone : 033 2449-0144, Mob.: 98306 63724
E-mail : kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

কেস জন্ডিস

বেশ অনেকদিন আগে "স্বাস্থ্যের বৃত্তে" প্রকাশিত একটা ক্যাপশন নজর টেনেছিল। ক্যাপশনটা হল "জন্ডিসের (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস-এ) কোনও ওষুধ হয় না। ক্ষিদে ফিরলে সব কিছু খান।" সেই সূত্র ধরে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখছেন **ডা. তুহিন রায়।**

প্রেক্ষাপটটা একটু বলি। আমি যে শহরে ডাক্তারি করি, সেই ছোট শহরটার নাম কাতরাস। ঝাড়খন্ড রাজ্যের ধানবাদ জেলার ঘনবসতি পূর্ণ ছোট শহর এটা। এখানে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে যে ছেলেখেলা হয়, তারই নমুনা আমার এই লেখায়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পাতায় পশ্চিমবঙ্গের সীমা সংলগ্ন একটা শহরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলে কেমন হয়, এটা ভেবেই স্টেথোস্কোপকে সাময়িক বিশ্রাম দিয়ে লেখনী ধরলাম।

জন্ডিস, জন্ডিস :

বছর দুয়েক আগে কাতরাস শহরে চারিদিকে শুধু একটা আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে— ''জন্ডিস'' ''জন্ডিস''। প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলোতে জায়গা নেই, প্রায় সব বেডই 'পিলিয়া পেশেন্টে' ভর্তি। ''পিলিয়া'' কথাটার মানে হলুদ রোগ, এখানকার ভাষায় জন্ডিসের নাম। সব পেশেন্টেরই চলছে সকালে বিকেলে ১০% ডেক্সট্রোজ—শিরা ফুঁড়ে। এবং সব বোতলেই আছে Inj. Hepamers Hepargard (L-Ornithine, L Aspartate)। এর প্রতিটা Vial এর স্থানীয় দাম ৩৮০ টাকা। এছাড়াও প্রত্যেক রোগীই লিভ-৫২, ইউডিলিভ ইত্যাদি ওষুধ পাচ্ছেন। এই সব ওষুধ হেপাটাইটিস বা কোনও রকম জন্ডিসেই বিন্দুমাত্র কাজে আসে না। যে পেশেন্টের কাছেই যাই সেই পেশেন্টেরই শয্যার পাশে রাখা আছে এক বান্ডিল আখ, গোটা ছয়েক শশা,

গোটাকয় মূলো, পেয়ারা ইত্যাদি। দৈনন্দিন প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া তারা বিছানা থেকে নামেন না। বিছানার সঙ্গে লেপ্টে থাকেন। যাকে বলে Glued to bed! তাদের কেউ বিছানা থেকে নামলেই একটা হইহই রব। ভাত, ডাল, তরকারি সব বন্ধ শুধু উক্ত ইঞ্জেকশন মিশ্রিত সকালে বিকেলে ১০% ড্রেক্সট্রোজ। উপরোক্ত পথ্য নেওয়ার ভিত্তি হল দীর্ঘদিনের অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস, যার দায়িত্ব কিছুটা স্বাস্থ্যের কাণ্ডারীদেরও। কিছু কিছু বেডে দেখি পেশেন্ট নেই। তারা কোথায়? তারা গেছে বাবাদের কাছে জড়িবুটি খেতে বা রোগ ঝাড়াতে। 'পিলিয়া রোগ কতো বুদ্ধিমান মানুষকে যে 'লাল' করে দিচ্ছে।

> জন্ডিস হওয়ার পূর্ববর্তী লক্ষণ (prodromal বা pre-icteric phase) এ ক্ষিদে না পাওয়া, বমি পাওয়া বা বমি হওয়া, অল্পতে ক্লান্ত হওয়া, আলো ভাল না লাগা, কাশি সর্দি, মাথায় ও সর্বশরীরে ব্যথা ইত্যাদি

এই পরিস্থিতিতে চলল তপ্ত তাওয়ায় রুটি সেঁকে নেওয়ার প্রতিযোগিতা। বর্তমান বিধায়ক প্রাক্তন বিধায়ককে বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেন—জল ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছু করেননি। আর প্রাক্তন বিধায়ক বললেন বর্তমান বিধায়কের নিষ্ক্রিয়তার জন্যেই এই মহামারী। কাগজওয়ালারা লিখতে লাগল, ''পিলিয়াকে চলতে মৌত বাড়তে যা রহা হ্যায়। প্রশাসন চুপ হ্যায়। পরের পরের দিন কাগজ খুলে দেখি ''মৌত কি সংখ্যা বারাহ্ (১২) হো গিয়া। কোই কারবাহি নেহি। প্রসঙ্গত বলে রাখি তথাকথিত এই মৃত্যুগুলো নিয়ে কিছু ব্যক্তিগত অনুসন্ধান করে তিনটে মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুটা জানতে পারি, প্রথমজন ৯০ বছর বয়েস, অ্যালকোহলিক, দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হল এক নবজাতক। সেই শিশুর শ্বাসকষ্ট ও জন্ডিস হয় (বোধ হয় Neonatal Septieamia)। তৃতীয় কেসে দীর্ঘদিনের ক্রনিক হেপাটাইটিস 'বি' ছিল, রোগীর পেটে হঠাৎ জল জমা হতে শুরু হয়। আমার মনে হয় মৃত্যুগুলোর কোনওটাই হেপাটাইসি-'এ'র ফলে হয়নি।

কাঁচাঘুম ভাঙাইও না :

রাজনৈতিক হল্লা বা শোরগোলে, মিডিয়ার চাপে অবশেষে স্বাস্থ্য দপ্তরের ও প্রশাসনের ঘুম ভাঙলো। জেলার উচ্চতম স্বাস্থ্য অধিকর্তা কাগজে বিবৃতি দিলেন ''পিলিয়া লাইলাজ বিমারি হ্যায়''। অর্থাৎ জন্ডিসের চিকিৎসা নেই। বকলমে বলতে চাইলেন ওঁর কিছু করার নেই। জন্ডিস আপনা আপনি সেরে যায়, এ কথাগুলো তিনি বলেননি। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো, সাধারণ মানুষের মনকে ওঁর বিবৃতি আরও আতঙ্কিত করে তুলল। রাঁচি থেকে চিকিৎসক বিশেষজ্ঞর দল এলেন, পর্যবেক্ষণ করলেন আর রাঁচি ফিরে গিয়ে রিপোর্ট পাঠালেন, কাতরাসে দূষিত জলের জন্য জন্ডিস হচ্ছে না। জলের নমুনা পরীক্ষায় ভাইরাস পাওয়া যায়নি। প্রশাসনিক অধিকর্তা ফাটা পাইপ লাইন খোঁজা ও মেরামত করার হুকুম দিলেন। মেন রোডের পাঁচ-ছয় জায়গায় বিশাল বিশাল গর্ত খোঁড়া হল, পাইপ লাইন বের হল। কিন্তু কোন ফাটা পাইপ, তার কী মেরামতি হল কিছুই বোঝা গেল না। নালী পরিষ্কারের নামে বাজারে স্থিত দোকানগুলোর সামনে নালীর উপরে স্ল্যাবগুলো ভেঙে চলে গেল, বাঁশ দিয়ে খোঁচা মেরে নালি সাফ করতে গিয়ে সবার নজর এড়িয়ে বেশ কিছু বাঁশ ওখানেই আঁটকে রইল। জন্ডিসের ছড়িয়ে পড়া কতটা আটকাল এতে তা জানি না। কিন্তু শুনেছি ৮-১০ লক্ষ টাকার টেন্ডার পাস হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনার স্তুপ কিন্তু মিনি পাহাড়ের আকার ধারণ করে পড়েই রইল। লোকমুখে শুনলাম সরকারি উদ্যোগে জন্ডিসের ওষুধ বিলি হচ্ছে। উৎসুক হয়ে গেলাম। দেখলাম গ্লুকোজ পাউডার ও লিভ-৫২ বিলি হচ্ছে। আর গরীব মানুষ ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করার মতো তাই নিচ্ছে। এ আরেক আবর্জনা!

> লিভার টনিক, লিভ ৫২ ইত্যাদি ওষুধ বাণিজ্যিক দিকটা দেখে— এতে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না, ক্ষতি হলেও হতে পারে।

জন্ডিস কেন হল?

বিবরণ অনেক হল, এবার রোগটার সম্বন্ধে একটু আলোচনায় আসা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আসলে জন্ডিস কোনও রোগের নাম নয়। অনেকে রোগের লক্ষণ হিসাবে জন্ডিস হতে পারে। কাতরাস শহরে যে রোগ থেকে জন্ডিস হচ্ছিল সেই রোগের নাম 'ইনফেকটিভ' হেপাটাইটিস। এটা হেপাটাইটিস এ, বি সি, ডি বা ই—এসব ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে হতে পারে। জন্ডিসের নানা কারণ থাকলেও এখানে বর্ণিত ক্ষেত্রে ও সাধারণ ভাবে হেপাটাইটিস এ-র এ-র প্রকোপ বেশি। তাই আলোচনা হেপাটাইটিস এ-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে। হেপাটাইটিস ডি'-র আলাদা অস্তিত্ব হয় না, হেপাটাইটিস 'বি'-র সঙ্গেই এটা বেঁচে থাকতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে।

হেপাটাইটিস-এ রোগের সংক্রমণ খাদ্য-পানীয়ে মল দ্বারা দূষণের ফলে হয়। অর্থাৎ হেপাটাইটিস 'এ'-তে আক্রান্ত ব্যক্তির মল থেকে ভাইরাস খাবার ও জলের মধ্যে দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে সংক্রামিত করে। তাই ঘনবসতি পূর্ণ জায়গা এবং যেখানে নিম্নস্তরের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেখানেই এর বেশি প্রকোপ দেখা দেয়। দেখা গেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খাবার, জল ও দুধের মধ্যে দিয়ে এই রোগ ছড়ায় বা কাজ করে। ছোট বাসস্থানে বহু জনের বাস বা বহুজনের সংস্থা (স্কুল, বিশেষত বোর্ডিং স্কুল, হোস্টেল) ইত্যাদিতে এর দ্রুত প্রসারণ ঘটে।

রোগের লক্ষণ :

তিনটে ধাপে রোগের লক্ষণগুলি দেখা দেয়। জন্ডিস হওয়ার পূর্ববর্তী লক্ষণ (prodromal বা pre-icteric phase) এ ক্ষিদে না পাওয়া, বমি পাওয়া বা বমি হওয়া, অল্পতে ক্লান্ত হওয়া, আলো ভাল না লাগা, কাশি সর্দি, মাথায় ও সর্বশরীরে ব্যথা ইত্যাদি—এগুলো জন্ডিস হওয়ার এক থেকে দু'সপ্তাহ আগে অনুভূত হয়। গন্ধ ও স্বাদের বোধে পরিবর্তিত অনুভূতি হয়। প্রস্রাবের রং হলুদ ও মলের রং সাদা হয় (জন্ডিস দেখা দেওয়ার ১-৫ দিনের আগে)। তারপরে চোখ হলুদ হয় ও সম্পূর্ণরূপে জন্ডিস দেখা দেয়। জন্ডিস দেখা দেওয়ার সঙ্গে (Icteric Phase) উপরোক্ত লক্ষণগুলো খানিকটা ভাল হয়ে যায়। তার পরে ঠিক হয়ে যাওয়ার পালা (Resolving phase), এবং সাধারণত সম্পূর্ণ ঠিক হতে ২-১২ সপ্তাহ লাগতে পারে।

একদম প্রাথমিক রোগের অবস্থায় মূত্রে বাইল সল্ট বাইল পিগমেন্ট পাওয়া যায়। রক্তে যকৃত বা লিভার নিঃসরিত এনজাইমগুলির (AST, ALT. Alk, Phosphatase) এর মাত্রা বাড়ে। তারপর রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, তারপর একটা স্তর অব্দি গিয়ে কমতে থাকে তার নিজস্ব নিয়মে বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়ছে বলে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। অবশ্য যদি হঠাৎ বিলিরুবিন খুব বেড়ে যায় (যেমন এক দিনে দশ বা কুড়ি মিলিগ্রাম) তখন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানো খুব জরুরি। এক্ষেত্রে prothrombin time বলে একটা পরীক্ষা আছে যার ওপর ডাক্তারবাবুরা নজর রাখেন।

হেপাটাইটিস এ-র চিকিৎসা কী?

আগেও বলেছি প্রায় সব রোগীই নিজের থেকেই ভাল হয়ে যায় (self remitting) এবং ঠিক হতে দশ দিন থেকে ১২ সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। ইনফেক্টিভ হেপাটাইটিস হলে দিনে অন্তত ২,০০০-৩,০০০ কিলো ক্যালরি শক্তি দেয় এমন খাবার প্রয়োজন। এখানে একটা ব্যাপার আছে। এ রোগে প্রথম প্রথম কিছুই খেতে ভাল লাগে না, বমি হয়। তখন এবং কেবল তখনই এক মাত্র একটু আই ভি ফ্লুইড (শিরা ফুঁড়ে জলীয় দ্রবণ) দেওয়া যেতে পারে। সেটার দরকার পড়ে খুব কম ক্ষেত্রেই। প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়ার জন্য ফলের রস দেওয়া যেতে পারে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে ক্ষিদে বাড়তে থাকে। 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'র সেই ক্যাপশন-এ ফিরে আসি ''ক্ষিদে ফিরে এলে সব কিছু খান।'' খেয়াল করুন 'সব' এর নিচে আন্ডারলাইন করা অছে। হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল— অ্যালকোহল, বেশিমাত্রায় প্যারাসিটামল, ঘুমের ওষুধ বা লিভারের ক্ষতি করতে পারে এমন ওষুধ নিষেধ। লিভার টনিক, লিভ ৫২ ইত্যাদি ওষুধ বাণিজ্যিক দিকটা দেখে— এতে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না, ক্ষতি হলেও হতে পারে। বিশ্রাম সম্বন্ধে বলি, সম্পূর্ণ বিশ্রাম (বা Bed rest) এর কোনও প্রয়োজন হয় না, যদিও প্রাথমিক স্তরে বিশ্রাম একটু আরামদায়ক হয়। জোর করে বিছানায় শুইয়ে রাখার কোনও মানে হয় না।

রোগটা ছড়িয়ে পড়া আটকাতে গেলে ব্যক্তিগত স্তরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (যেমন খেতে বসার আগে ও পরে ভাল করে হাত ধোওয়া, মল ত্যাগের পরে ভাল করে জল ও সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া ইত্যাদি। সামাজিক স্তরে আবর্জনা যথাযথ পরিষ্কার করার ওপর জোর দেওয়া দরকার। রোগ প্রতিষেধক ভ্যাকসিনও আছে কিন্তু এর ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে হেপাটাইটিস-এ ভ্যাকসিন লাভ কতটুকু তা বিতর্কিত—তাই সে আলোচনায় গেলাম না।

হেপাটাইটিস-'এ'-র প্রায় সব রোগীই ভাল হয়ে যায়। এবং সময় লাগে ১০ দিন থেকে ১২ সপ্তাহ। বেশি বয়স, তৎসহ অন্য কোনও জটিল রোগ যেমন হার্ট ফেলিওর মধুমেহ, রক্তাল্পতা ইত্যাদি থাকলে বেশি সময় লাগতে পারে। প্রথমেই যদি কোনও রোগী পেটে জল বা হাত পা ফোলা নিয়ে আসে তখন সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

এই রোগ সম্বন্ধে আপনার সচেতনতা রোগকে ভিত্তি করে মুনাফা লোটার প্রচেষ্টা আটকাতে পারে। আশা করব সাধারণ মানুষ ও স্বাস্থ্য বিভাগ বৈজ্ঞানিক ভাবে এর মোকাবিলা করুক। এই আলোচনা পূর্ণ হল না, একবারে সবকিছু আলোচনা করলে বুঝতে খুব সুবিধা হয় না। তবে সব থেকে প্রয়োজনীয় কথাগুলোই আপনাদের বললাম, শেষে আবার বলি— হেপাটাইটিস 'এ' রোগকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখুন। আবার মনে করিয়ে দিই—''এর কোনও ওষুধ হয় না, ক্ষিদে ফিরলে সব খান''।

লেখক পরিচিতি : ডা. তুহিন রায়, এমবিবিএস। ঝাড়খণ্ড রাজ্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৫০ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক

প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি।

১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

ফোন : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২।

কালের ভালবাসা

সায়মদেব মুখার্জি

[এক-দেড় বছর বয়সে অজানা জ্বর। হাত পায়ের শক্তি চলে যাওয়া। আস্তে আস্তে কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া। সেই অবস্থা থেকে কী ভাবে ঘুরে দাঁড়াল ওম।]

জীবন পরিবর্তনশীল। এই কথাটা মানুষ বোধহয় বিশ্বাস করতে চায় না সব সময়। কিন্তু কোনও কোনও সময় মানতে বাধ্য হয়। এমন কিছু পরিবর্তন, যে পরিবর্তন জীবনে ভাল এবং খারাপ দু'টো লেখাই এক সঙ্গে এনে দেয়। ওমের জীবন আস্তে আস্তে পাল্টাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সে তার কথা বলার শক্তিও হারিয়েছে। তখন তার বয়স ১৩। কিছু কিছু সময় চূড়ান্ত ক্ষোভে প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়ত সে। সেই ক্ষোভ আরও বেশি বেশি করে আসতো, যখন তার কিছু ভালবাসার মানুষ অজান্তেই তার প্রতিবন্ধকতাকে 'ভগবানের দেওয়া পাপ' বলতেন।

মানুষের জীবনে এমন কিছু সময় আসে, যখন হীরেও কয়লায় রূপান্তরিত হয়। আর সেই সময়গুলো মানুষের জীবনে আসে অজানা ঔদ্ধত্যের জন্য। ওমের জীবনে ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সময় সেই ঔদ্ধত্যে ভরপুর। তার কারণ সে নিজে ছিল না, ছিল সমাজ। অন্ধকার আকাশে যেমন তারাদের ছোট ছোট আলো দেখা যায়, ওমের জীবনেও সেই ঔদ্ধত্যের সময়ে কোনও এক মানসিক অত্যাচারের ফলে সে হয়ে উঠল প্রতিবাদী। যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন সামনে হাত চালানো ছাড়া কিছু করার থাকে না মানুষের। এই সময়েই প্রথম কোনও এক অপছন্দের মানুষকে সে বলে, তার চৌকাঠের ওপর থেকে পা সরিয়ে নিতে। আর বলে চোখের ইশারায়। মানুষকে যখন সে ভালবাসতে ভুলে যাচ্ছিল, সেই সময় তার প্রিয় সেই শিক্ষিকা, ঝর্ণা আন্টি মারা গেলেন। তিনি যেন তাঁর মৃত্যু দিয়ে ওমকে শিখিয়ে গেলেন ভালবাসতে। তাঁর মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখানোর জন্যই বোধ হয় ওমকে তিনি ডেকে নিয়েছিলেন কাছে। ভেঙে পড়ল, চুরমার হয়ে গেল ওম, কালের সেই আশীর্বাদে।

ঝর্ণা আন্টি মারা গেলেন। তিনি যেন তাঁর মৃত্যু দিয়ে ওমকে শিখিয়ে গেলেন ভালবাসতে

ধর্মের দিকে তার মন আকৃষ্ট হতে শুরু করল, যখন সে অষ্টাবক্র মুনির কথা শুনলো, তখন তার মনে হল, নাহ্, ঠিক আছে। ইতিহাস থেকে কিছু গল্প তাকে উদ্বুদ্ধ করত। নেপোলিয়নের জীবন তাকে সরিয়ে আনতে চাইতো ঔদ্ধত্যের থেকে। কিন্তু রক্তে তার জমিদারি পরিবারের জিন। ভালবাসা দিয়ে সেই ঔদ্ধত্যকে চাপা দিতে গেলে তাকে যে আবার শেষ থেকে শুরু করতে হবে।

প্রতিবন্ধকতা যখন তাকে নানা দিক থেকে গ্রাস করছে, ওম তখন তার মৃত্যু সম্পর্কে অনেকটাই সচেতন। তার বয়স তখন ১৮ বছর। তার বাবার সেই দু'দিকেই ধারওয়ালা তরোয়ালের শিক্ষার কারণে সে বুঝতে পারল, আর ১২ কী ১৪ বছর তার কাছে আছে। ঠিক সেই সময়েই সে যখন ডিপ্রেশনের কালো গহ্বরের দিকে এগোচ্ছে, সে হঠাৎ পৌঁছে গেল সিকিমে। সেই হিমের দেশে গিয়ে সে যেন এক নবজাগরণের ডাক পেল। গ্যাংটকের সর্বোচ্চ জায়গা হনুমানটক। সেই হনুমানটকের খাদের ধারে সে যখন তার হুইল চেয়ারটা নিয়ে বসে আছে, তখন যেন হিমালয় তার কাছে পাঠাল এক বার্তা। বৈজ্ঞানিকেরা হয়ত বলবেন, যে হাওয়ার সঙ্গে পাহাড়ের ধাক্কা লেগে যে আওয়াজের সৃষ্টি হয়, সেই আওয়াজ ওমের কানে এসেছিল, এবং তার মানসিক পরিস্থিতির জন্য ওম সেই হাওয়ার শব্দকেই বার্তা বলে ধরে নিয়েছিল। তা সে যা-ই হোক না কেন, ওমের জীবনে সেই দিনটা ছিল এক অদ্ভুত পরিবর্তনের দিন। সে শুনেছিল হিমালয়ের সেই বার্তা, যা তাকে বলে— জীবনে তো এখনও বেঁচে আছো, কিন্তু এই ভাবে বেঁচে লাভ কী— চারিদিকে দেখো, শেখো এবং জীবনকে সঠিক দিশায় নিয়ে যাও।

কলকাতায় ফিরে আসার পর ওম আবার নতুন করে লিখতে শুরু করল। তার লেখার একমাত্র মাধ্যম সে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন পেত। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পলসিতে (আইআইসিপি) একটা স্পেশাল সফটঅয়্যারের মাধ্যমে কম্পিউটারে একটা বিশেষ সুইচ দিয়ে লিখতে পারত সে। কিন্তু সে সুযোগ পেত, সপ্তাহে দুই-দুই চার ঘণ্টা মাত্র। বারবার জিভ দিয়ে সেই সুইচ ব্যবহার করতে করতে আস্তে আস্তে সে ঝাল খাবার খাওয়ার শক্তিটা হারাল। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সে তা-ও ওই একটাই অবলম্বন ধরে রইল। তার প্রিয় সুধা আন্টিকে সে একটা চিঠিতে লিখেছিল, 'সে কোনও একটা কনফারেন্সে একটা পেপার প্রেজেন্ট করতে যেতে চায়।' অনেকের মনে এক অদ্ভুত কৌতুক এনেছিল সেই চিঠি কিন্তু সুধা আন্টি তার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে ১৯৯৯ সালের ১৮ নভেম্বর তাকে বলেন, সে যেন একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে। ২০০০ সালের ২২ এবং ২৩ জানুয়ারি প্রেজেন্টেশনটা সে কলকাতার একটা কনফারেন্সে দেখাতে পারে।

এক নতুন দরজা খুলে ফেলল ওম কালের আশীর্বাদে। নতুন শতাব্দী তার কাছে নিয়ে এল এক নতুন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। যে প্রাঙ্গণে ওম শুধুই দৌড়াতে পারে। শরীর দিয়ে অবশ্যই নয়, মন দিয়ে। সেই দৌড় যখন সে শুরু করল, তখন একের পর এক জায়গায় সে পেপার প্রেজেন্ট করতে শুরু করল। তার স্বপ্ন ছিল বিদেশে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা। সেই লক্ষ্যেও সফল হল। কিন্তু ওম যে বড্ড তাড়াতাড়ি দৌড়ে ফেলেছে। ২০০৪ সালে ব্রাজিলে যখন সে একটা 'লাইফ টাইম অ্যাওয়ার্ড' নিতে গেল, তার বয়স তখন ২৪। সেখান থেকে ফেরার সময় একটা অদ্ভুত শূন্যতা তৈরি হল ওমের মনে। শুধুই যেন সে ছটফট করছিল ভিতরে ভিতরে। 'এর পর কী?' এই প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল শুধু।

২০০৪ সালে সুনামির দিন ওম কলকাতায় একা, মা-বাবা রাজস্থানে। সে তার বাড়ির পরিচারিকা এবং গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে বসে টেলিভিশনে

দেখল সেই ধ্বংসের লীলা। তার সঙ্গে আরও কিছু সে দেখতে পেল আরও কিছু গল্প সে শুনতে পেল। তার মধ্যে একটা হল, ধ্বংসের মধ্যে এক নতুন জীবনকে প্রাণ দেওয়া। এক মা বাঁচার জন্য উঠে পড়েছিলেন একটা গাছে। প্রকৃতি সেই নবজাতকের জন্মস্থান সেই গাছের ওপরেই লিখে দেয়। প্রকৃতির সেই ইশারা ওমকে বলে দেয়, ধ্বংসের মধ্যেও জীবন থাকে। থাকে আরও অনেক অনুভূতি।

২০০৫ সালের ১ অক্টোবর যখন ওমের মায়ের হিস্টেরেকটমি অপারেশন করিয়ে বাবা বাড়ি ফিরলেন, ওম তখন মাংসপেশির ব্যথায় ছটফট করছে। অতিরিক্ত উত্তেজনা ওমের মাংসপেশিকে শক্ত করে দিত। ধরতো টান। সে না থাকতে পেরে বাবাকে বলল, ''বাবা কষ্ট হচ্ছে খুব। আর পারছি না।'' বাবা তাঁকে বললেন, ''This is the beginning of the end''। ওম চারিত্রিকভাবে ইউথানেশিয়া মানে না। কিন্তু সেই সব দিনে কোনও কোনও মুহূর্ত তাকে যেন বলত, এই যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। ওম কালের সন্তান। কাল এবং প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে ওমের জীবন সব সময় সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। একদম তলানিতে ঠেকে যাওয়ার সময় ওম ফিরে পেল তার জীবনীশক্তি।

পৃথিবীর অন্য প্রান্তে সানফ্রান্সিসকোয় ওমের এক ভাগ্নে ওমের মতোই আস্তে আস্তে শারীরিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলছিল। ওমের পিসতুতো দিদির ছেলে সে। যখন ডাক্তার দেখানো হয় তিন বছরের সেই ছেলেটাকে, ডাক্তার ওমের দিদিকে প্রশ্ন করে জেনে নেন ওমের কথা। দিদিকে অনুরোধ করেন ওমের কেস হিস্ট্রি পাঠাতে। ২০০৫ সালের নভেম্বর মাস। ওমের সেই তিন বছর বয়সের বোনপো যখন ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে ভাল হতে লাগলো, ওমের দিদি ডাক্তারকে জিজাসা করলেন যে, তাঁর ভাইকে সেই ওষুধ দেওয়া যায় কি না? একটু হেসে সেই ডাক্তার ওমের বাবাকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। উপগ্রহ যোগাযোগ এবং ই-মেল খারাপ কী করেছে, তার উদাহরণ হয়তো অনেক। কিন্তু এই খবর আদানপ্রদানের ব্যবস্থা (যাতে আগে অনেক সময় লাগতো) কম্পিউটারের কিছু বোতাম টিপে আর মাউসে ক্লিক করে কত সহজে এবং তাড়াতাড়ি করা যায়, তার সুফল মনে হয় ওমের পরিবার ছাড়া খুব কম লোকই জানেন। ১৭ নভেম্বর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পলসি থেকে ওম যখন কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়ার মুখে, তখন তার মনে হল শরীর অসম্ভব ক্লান্তিতে ডুবে যাচ্ছে। কোনও রকমে সে তার অবস্থা জানাল তার দুই ইনস্ট্রাক্টরকে। তারা দু'জনেই এক সঙ্গে বলে উঠল, ''কাল তোকে আসতে হবে না।''। যদিও পরের দিন ওমের আইআইসিপি'তে উৎসব-জন্মদিনের।

ওম যখন বাড়ি ফিরে ভাতের প্রত্যেকটা দলা কোনও রকমে গলার ওপারে পাঠাচ্ছে, দুপুর তখন আড়াইটে। ওমের বাবা দরজা দিয়ে যখন ঢুকলেন, দেখলেন যে ওমের মা ছেলেকে খাটের ওপর বসে খাওয়াচ্ছেন। একটা ছোট্ট ওষুধের প্যাকেট মায়ের কোলের ওপর ছুড়ে দিয়ে তিনি বললেন, ''কোনও নিউরোলজিস্ট বন্ধু বলতে পারল না, ওমকে কী ডোজে ওষুধ দেব। দ্যাখো একটা করে দিনে তিনবার খাইয়ে কী হয়।'' রাতের ওষুধটা খেয়ে ওম যখন বিছানায় মাথাটা রাখল, দেখল, ওর শরীর থেকে সব ক্লান্তি ছেড়ে যাচ্ছে। এবং সে বুঝতে পারছে না কিছুতেই যে আজ এত উত্তেজনায় কেন ভুগছে। পরদিন সকালে জলখাবারের পর আরেকটা ওষুধ খাওয়ার পর সে ভাবতে শুরু করল, তার শরীরের ব্যথাগুলো কেন তখনও শুরু হয়নি। ১৮ নভেম্বর, ২০০৫, একটা শুক্রবার। লম্বা ওটি লিস্ট শেষ করে বাবা যখন বাড়ি ঢুকলেন, একটু অবাক হলেন ওমের দিকে তাকিয়ে। পাঁচ মিনিট পর ওমের বাবা এবং মা যখন ভিতরের ঘর থেকে বাইরের ঘরে এলেন ওমের কাছে, ওম শুধু বলল, ''বাবা, ওষুধটা ক্লিক করে গেছে।''

> "বাবা, ওষুধটা ক্লিক করে গেছে

প্রথমে ছিল সেরিব্রাল পলসি, যার সম্ভাবনা নাকচ হয়ে গেল ১৯৮৯ সালে। তারপর নিউরোমাসকুলার ডিসট্রফি — যা ওমকে শূন্যতার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ওম তার জীবন ফিরে পেল, যখন অসুখটার নাম জানা গেল— ডোপা রেসপনসিভ ডেস্টোনিয়া। ওমের শরীরে এই অদ্ভুত এনজাইমটা তৈরি হয় না। যার কারণ একটা ছোট্ট জেনেটিক ডিফর্মিটি।

মানুষ যখন বুঝতে পারে, মৃত্যুর চেয়ে জীবন অনেক সুন্দর এবং যে কোনও সময় যে কোনও ঘটনা জীবনকে সুগম করে দিতে পারে, তখন সে জীবনে আশার আলো দেখতে পায়। যে আশার আলো প্রতি মুহূর্তে চুম্বকের মতো টানতে থাকে জীবনকে, মৃত্যুর দিক থেকে।

[বন্ধুরা, এই ওমই আপনাদের ডেন!]

লেখক পরিচিতি : সায়মদেব মুখার্জি, এক এফএম স্টেশনের প্রাক্তন রেডিও জকি, আর জে ডেন নামেই পরিচিত)।

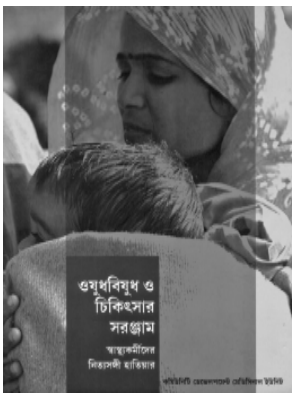

সাধারণ অসুখবিসুখ ও ওষুধবিষুধ সম্বন্ধে জানতে পড়ুন—

ওষুধবিষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিত্যসঙ্গী হাতিয়ার

সংগ্রহ করবার ঠিকানা :

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট

৮৬সি, ডা. সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৪ফোন : ২২৬৫-২৩৬৩

সোরিয়াসিস

"সোরিয়াসিস" রোগটা সম্পর্কে এখনও সব মানুষের সঠিক ধারণা নেই। এই সচেতনতার অভাবের জন্য দু'ধরনের সমস্যা দেখা যায়— এক, রোগটাকে ঠিকমতো গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে সঠিক চিকিৎসা শুরু হতে দেরি হয়ে যায় বা রোগী নিয়মিত চিকিৎসা করান না। দুই, রোগের নামটা শুনলেই রোগী অযথা আতঙ্কে ভোগেন। যেহেতু "সোরিয়াসিস" সাধারণ ক্ষেত্রে মারাত্মক নয়, কিন্তু এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী রোগ, সবারই এই রোগের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন— লিখছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস।**

'সোরিয়াসিস' কেন হয়?

রোগীর এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমরা সব সময় হিমশিম খেয়ে যাই। কারণ, রোগটা শরীরের কী পরিবর্তনের ফলে হয়, কী কারণে বাড়ে— এভাবে ব্যাপারটা কিছুটা বোঝানো সম্ভব। কিন্তু ঠিক কী কারণে হয় সেটা অনাক্রম্যবিদ্যা (immunology) দ্বারা কিছুটা বোঝা গেলেও এখনও পুরোপুরি কারও জানা নেই। আর সেই জটিল প্রক্রিয়ার ওপর জীবনযাপনের দ্বারা কোনও নিয়ন্ত্রণ বা কোনও বদল আনা যায় না এভাবে রোগটাকে কব্জা করাও যায় না। তাই ও কথা থাক। সোজা ভাবে বলা যায়, ত্বকের একেবারে ওপরের স্তর যেটা তৈরি হয়ে মৃত কোষ হয়ে ঝরে পড়তে সাধারণভাবে ২৮ দিন সময় লাগে, সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে ত্বকের কিছু কিছু জায়গায় এই

কোষগুলো মাত্র চারদিনেই তাদের জীবনবৃত্ত শেষ করে ফেলে— ফলে সেই সব অতিরিক্ত কোষ ঢিবির মতো হয়ে ত্বকের ওপর লেগে থাকে।

বিশ্বে শতকরা ১-৩ ভাগ লোকের সোরিয়াসিস রোগটা দেখা যায়।

"সোরিয়াসিস" রোগের লক্ষণ কী?

শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লালচে একটু উঁচু ছোপ দেখা যায়, ছোপের ওপরে অভ্রের মতো রূপোলি আঁশ থাকে। একটু চুলকে দেখলে ওই সাদা বা রূপোলি আঁশ ঝরে ঝরে পড়ে। বেশি চুলকালে রক্তবিন্দুও দেখা যায়।

প্রধানত হাঁটু, কনুই, হাত ও পায়ের বাইরের দিক, পিঠের নিচের দিক ও মাথায় সোরিয়াসিসের ছোপ দেখা যায়, কিন্তু ত্বকে যে কোনও জায়গাতেই সোরিয়াসিস হতে পারে। মাথার ত্বকের সোরিয়াসিসকে খুসকি ও ছত্রাক সংক্রমণ থেকে আলাদা করতে হয়। কারণ অনেক সময় এগুলো আপাতদৃষ্টিতে দেখতে একই রকম লাগে। সোরিয়াসিসের যে আঁশগুলো ওঠে তা খুসকির থেকে পরিমাণে অনেক বেশি। খুসকি সাধারণত পুরো মাথার ত্বক জুড়ে ছড়িয়ে থাকে আর সোরিয়াসিসের ছোপ আলাদা আলাদা এক একটা ঢিবির মতো থাকে।

অনেক সময় শরীরের ভাঁজে ভাঁজে সোরিয়াসিস হয়, বিশেষত শিশুদের। ভাঁজের (Flexural) সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে আঁশ কম দেখা যায়, বরং একটু বেশি লালচে হয়।

সোরিয়াসিস যখন 'নখ'কে আক্রমণ করে তখন আক্রান্ত নখগুলোতে ছোট ছোট বিন্দুর মতো গর্ত হয়, কখনও বা নখ মোটা হয়ে যায়, নখটা নিচের মাংস থেকে উঠে আলাদা হয়ে যায়। হাতে ও পায়ের পাতায় সোরিয়াসিস হলে প্রথমে ছোট ছোট ফোস্কা হয়, তারপরে ওই অঞ্চলের চামড়া মোটা হয়ে ফেটে যায়।

আর এক ধরনের সোরিয়াসিস শিশু বা কম বয়সীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়— হঠাৎ দুএক দিনের মধ্যে সারা গায়ে ছোট ছোট সোরিয়াসিসের ছোপ বেরোয়। স্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুর সংক্রমণের সঙ্গে এই সোরিয়াসিসের একটা সম্পর্ক লক্ষ করা গেছে।

সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস :

দেখা যায় শতকরা ৮ ভাগ সোরিয়াসিস রোগীর ক্ষেত্রে বেশির ভাগ রোগীর হাতে পায়ের ছোট ছোট গাঁটগুলোতে ব্যথা হয়— ফুলে যায়, নড়াচড়াতে অসুবিধা হয়। দীর্ঘদিন থাকলে অঙ্গ বিকৃতিও ঘটে।

এরিথ্রোডার্মা বা লোহিতবর্ণ ত্বক :

এটা সোরিয়াসিস রোগের একটা গুরুতর অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে শরীরের প্রায় সম্পূর্ণ ত্বক লালচে বর্ণ ধারণ করে, ফুলে যায়, শুকনো খোসা ওঠে। ত্বক যেহেতু হার্ট, কিডনি, লিভার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মতোই একটা অঙ্গ এবং এই অঙ্গের কিছু শরীরবৃত্তীয় কাজ আছে, সম্পূর্ণ ত্বক আক্রান্ত হলে এই কাজ ব্যাহত হয়। ফলে ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে সোরিয়াসিস রোগীর এই একটা মাত্র ক্ষেত্রে প্রাণের ঝুঁকিও থাকে।

সোরিয়াসিস রোগ কী কী কারণে বাড়ে এবং রোগীর করণীয় কী?

ত্বক শুকনো হয়ে গেলেই এই রোগ বেশি বাড়ে— যে কারণে শীতকালে এই রোগীরা বেশি কষ্ট পান আবার আর্দ্র গরমের সময় কিছুটা ভাল থাকেন।

বেশি চুলকানো রগড়ানো, বেশি গরম জলে স্নান সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে ভাল নয়। ত্বকের যে জায়গায় কোনও রকম ঘষা, আঁচড়ানো, চুলকানো হয় সেখানে নতুন নতুন ছোপ দেখা যায়। ডাক্তারি পরিভাষায় এক "ক্যুবনার ফেনোমেনন" (Koebner phenomenon) বলা হয়।

সোরিয়াসিস রোগী সারা বছর গায়ে নারকেল তেল, ময়শ্চারাইজার মাখলে ভাল হয়। আর সাবান নির্বাচন করতে হবে কম ক্ষারযুক্ত। সাবান মাখার সময় ছোবড়া জাতীয় জিনিস কখনও ব্যবহার করা চলবে না। নরম তোয়ালে দিয়ে না রগড়ে চেপে চেপে গা মুছতে হবে।

সোরিয়াসিস একেবারেই সংক্রামক রোগ নয়।

সোরিয়াসিসের চিকিৎসা কী ভাবে করা হয়?

সোরিয়াসিসের চিকিৎসা শুরু পঞ্চাশ টাকা দামের সাধারণ স্টেরয়েড মলম দিয়ে আর শেষ লাখেরও ওপরে "বায়োলজিক্যালস্" ইঞ্জেকশনে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে চিকিৎসার কতগুলো ধাপ! রোগীর সামর্থ্য, রোগের তীব্রতা ও বিস্তার, রোগ কতটা দীর্ঘস্থায়ী, ত্বকের কতটা, কোন্ জায়গা আক্রান্ত, কোন্ গাঁট কতটা আক্রান্ত ইত্যাদি সব কিছু বিবেচনা করে চিকিৎসক সোরিয়াসিস রোগীর ওষুধ নির্ধারণ করেন।

মুখ্য চিকিৎসাগুলো নিম্নরূপ :

লাগানোর ওষুধ :

- সব সোরিয়াসিস আক্রান্ত সব রোগীকেই সব সময় ত্বক তৈলাক্ত রাখার জন্য ক্রিম মাখতে হয়।
- রোগের তীব্রতা অনুযায়ী কম / মাঝারি / জোরালো ধরনের স্টেরয়েড মলমের সঙ্গে দেওয়া হয়।
- স্টেরয়েড মলমের সঙ্গে স্যালিসিলিক অ্যাসিড যুক্ত থাকলে তা আরও ভাল কাজ করে কারণ এই অ্যাসিড জমা কেরাটিন স্তরকে গলিয়ে দেয়।
- মাথায় স্টেরয়েড ও স্যালিসিলিক অ্যাসিড যুক্ত লোশন লাগাতে দেওয়া হয়।
- কখনও কখনও 'কোল টার' (Coal tar) যুক্ত মলমও ব্যবহার হয়।
- ভিটামিন ডি জাতীয় যৌগ ক্যালসিপোট্রিয়ল মলম আর একটা বিকল্প।

মুখে খাওয়ার ওষুধ ও অন্যান্য চিকিৎসা :

মুখে খাওয়ার ওষুধ সাধারণত দেওয়া হয় যখন অনেকটা জায়গা জুড়ে সোরিয়াসিসের ছোপ থাকে এবং যখন লাগানোর ওষুধে কোনও উপকার হয় না সেই সব ক্ষেত্রে।

- সোরালেন জাতীয় ওষুধ
- বিশেষ ল্যাম্পের দ্বারা UVA (অতি বেগুনি-এ)। প্রযুক্তিগত UVA আলোর ব্যবস্থা না থাকলে সূর্যরশ্মিও কার্যকরী।

- মুখে সোরালেন + UVA রশ্মি = PUVA পদ্ধতি।
- স্বল্প দৈর্ঘ্য UVB রশ্মি।
- অ্যাসিট্রেটিন, আইসোট্রেটিনয়েন জাতীয় ভিটামিন 'এ'-জাত যৌগ। দাম বেশি, ডাক্তারের নজরদারিতে খাওয়া উচিত।
- মেথোট্রিক্সেট (Methotrexate) নামক ওষুধ। ওষুধটার দাম খুব বেশি নয় এবং খুবই কার্যকরী। লিভার ঠিকমতো কাজ করছে কি না এবং কিছু রক্ত পরীক্ষা করে ওষুধটা দেওয়া হয়। তবে ডাক্তারের নিয়মিত পরামর্শ ছাড়া মেথোট্রেক্সেট খাওয়া উচিত নয়, কারণ এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গুলোর ওপর নজরদারি করা দরকার।
- সাইক্লোস্পোরিন নামক ওষুধ। অন্য চিকিৎসায় কোনও কাজ না হলে ব্যবহৃত হয়। তবে ডাক্তারের নজরদারি দরকার।
- ইনফ্লিক্সিম্যাব, অ্যালিফাসেপ্ট, ইফালিজুম্যাব ইত্যাদি বায়োলজিক খুব দামি। রোগীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে বিশেষ বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী সোরিয়াসিসে ব্যবহৃত হয়।

সোরিয়াসিস কি সারে?

প্রত্যেক ডাক্তারকেই প্রতিনিয়ত রোগীর এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্যিই খুব কঠিন। কারণ, সাধারণ ভাষায় সারা বলতে যদি চিরকালের মতো রোগমুক্তি বোঝায়, তবে কোনও চিকিৎসা দ্বারাই সোরিয়াসিস সারে না। আবার কথাটা পুরো ঠিকও নয়। অর্থাৎ চিকিৎসা ঠিকমতো হলে রোগীর শরীরে সোরিয়াসিসের চিহ্ন থাকে না এমন হয়— বেশ কিছু সময় চিকিৎসা ছাড়াও রোগমুক্ত থাকে এমনও হয়। কিন্তু রোগীকে এই আশ্বাস দেওয়া যায় না যে ''আপনি এইটুকু মেয়াদ পর্যন্ত চিকিৎসা করালে আপনার রোগ সম্পূর্ণ সেরে যাবে আর কখনও হবে না। ডায়াবেটিস, হাই ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদি অসুখের মতো রোগীকে এটা বলা যায় যে ''নিয়মিত চিকিৎসার আওতায় থাকলে আপনার রোগটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, আপনার কষ্ট লাঘব হবে।''

সুতরাং একটা দীর্ঘস্থায়ী নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সোরিয়াসিস এমন একটা অসুখ।

লেখক পরিচিতি : ডা. শর্মিষ্ঠা দাশ, এমবিবিএস, ডিভিডি। একটা সরকারি হাসপাতালে চর্মরোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

শব্দদূষণ ও মনের ওপর তার প্রভাব

শব্দের এক মহা সমুদ্রে যেন আমরা ডুবে আছি। কত রকম শব্দ আমাদের চারপাশে। শহরে সেই সব শব্দের প্রকৃতি এক রকম, আবার গ্রামাঞ্চলে শব্দের প্রকৃতি অন্যরকম। সন্ধ্যার সময় যদি গাছপালা আছে এমন জায়গায় যাওয়া যায় তবে অনেক পাখির কলকাকলি শোনা যায়। সেই শব্দ আমাদের শুনতে ভালই লাগে। আবার বাড়ির পাশে কোনও ফ্ল্যাটবাড়ির তৈরির কাজ চলতে থাকলে বিভিন্ন রকম যন্ত্রের আওয়াজ হয় আর আমাদের যেন কেমন অস্থির লাগে। কোনও হালকা ভেসে আসা গান (রেডিও থেকে) পথ চলতে চলতে কানে এলে হয়তো নস্টালজিক হয়ে পড়া যায় অথচ ওই একই গান পাড়ার পূজো প্যান্ডেলে গাঁক গাঁক করে বাজলে মনে হয় প্রাণটা শরীর থেকে বেরিয়েই যাবে। কোন্ শব্দ শ্রুতিমধুর, কোনটা বা সহ্য করা কঠিন, শব্দের এই তারতম্য কী কারণে হয় ও শব্দ দূষণের প্রভাব আমাদের মনের ওপর কতটা এসব নিয়েই এবারের প্রতিবেদন লিখছেন **রুমঝুম ভট্টচার্য।**

শব্দের প্রকৃতি ও মাত্রা দুটো জিনিসের ওপর নির্ভরশীল :

১। ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency) : শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে হাওয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি সেকেণ্ডে কতবার তরঙ্গ সৃষ্টি হল (The number of pressure variation / sec) তাকেই ফ্রিকোয়েন্সি বলে এবং তা হার্ৎজ (Hertz বা Hz) দিয়ে মাপা হয়। ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি হবে শব্দ তত উচ্চ গ্রামের (highpitched) বা তীক্ষ্ণ হবে। যেমন ড্রামের শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি কম, বাঁশির শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি সেই তুলনায় অনেক বেশি।

২। আর একটা ধর্ম হল শব্দের জোর কতটা, যাকে loudness বলা হয়। সচরাচর জোর শব্দের ক্ষেত্রে তরঙ্গের চাপের পরিবর্তন (pressure variation) অনেকটা হয়। তরঙ্গের চাপের পরিবর্তন পাসকেল দিয়ে মাপা হয় (pa)। মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয় খুব মৃদু যে শব্দ, শুনতে পায় তার তরঙ্গ চাপ পরিবর্তন $20x10^{-6}$pa। একে থ্রেসহোল্ড সফ্ হিয়ারিং (Threshold of hearing) বলা হয়। এর থেকে কম তরঙ্গচাপের শব্দ শোনা যায় না।

পাসকাল এককের ব্যবহার অসুবিধাজনক বলে শব্দের মাত্রা মাপার জন্য ডেসিবেল স্কেল ব্যবহার করা হয়। $20x10^{-6}$pa এই তরঙ্গচাপ মানুষের শ্রবণযোগ্য প্রথম শব্দতরঙ্গ। একে O DB ধরা হয়।

কয়েকটা সাধারণ শব্দের উৎস	মোটামুটি ভাবে উৎপন্ন তরঙ্গচাপ (in pa)
সব থেকে কম শব্দ যা মানুষ শুনতে পায়	$20x10^{-6}$ pa (O dB)
রকেট পাঠানোর শব্দ	2,000 pa
ট্রেনের শব্দ 25 মিটারের মধ্যে।	0.2 pa ($2x10^{-1}$ pa)

তরঙ্গচাপ শূন্য ডেসিবেল (O dB) থেকে একশো কুড়ি (120 dB) র মধ্যে থাকলে তা শ্রবণযোগ্য অর্থাৎ মানুষের কান 0-120 dB তরঙ্গচাপের শব্দ শুনতে পায়।

প্রশ্ন হচ্ছে ডেসিবেল স্কেলে শব্দ কী ভাবে বাড়ে? মানে বাস্তবে, আমরা অনেক শব্দ এক সঙ্গে শুনতে পাই। সবার নিজস্ব এক ডেসিবেল মাত্রা

আছে। তা হলে যখন শব্দগুলো এক সঙ্গে হচ্ছে তখন সে গুলোর যোগফল কী হতে পারে। সাধারণত যোগ বলতে আমরা যা বুঝি ডেসিবেল মাত্রার যোগফল তার থেকে একটু আলাদা। আমরা ৬০টি আপেলের সঙ্গে আরও ৬০টা আপেল যোগ করলে মোট ১২০ টা আপেল পাই। কিন্তু ষাট ডেসিবেল শব্দ ষাট ডেসিবেলের সঙ্গে জুড়লে (60 dB+60 dB) 63 ডেসিবেল হয়।

ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী মানুষ 20 Hz থেকে 20,000 Hz পর্যন্ত শব্দ শুনতে পায়। শব্দের তরঙ্গচাপ এক রেখে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো কমানো হলে শব্দের জোর ক্রমান্বয়ে বাড়ে বা কমে। অর্থাৎ একই তরঙ্গচাপযুক্ত শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz হলে যা মনে হবে তার তুলনায় 2,500 থেকে 3000 Hz হলে অনেক জোর মনে হবে। তাই শব্দ শোনার যে সীমারেখার (threshold) উল্লেখ আগে করা হয়েছে তাও কেবল তরঙ্গচাপ নয় ফ্রিকোয়েন্সির ওপরও নির্ভরশীল।

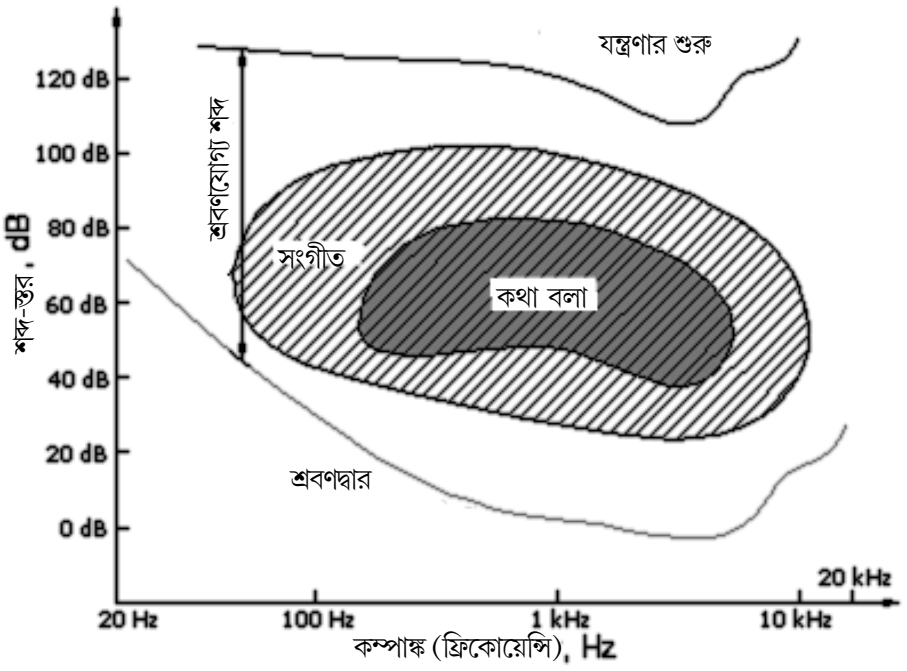

ওপরের লেখচিত্র দেখলে বোঝা যাবে শব্দের নির্দিষ্ট তরঙ্গচাপ ও ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে মানুষের কানে ব্যথা লাগতে পারে।

এখনও পর্যন্ত যা আলোচনা করা হল তার ভিত্তিতে এটা পরিষ্কার যে শব্দ শ্রুতিমধুর হবে, না তা আমাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক হবে সেটা শব্দের দুটো গুণের ওপর নির্ভর করছে— (১) তরঙ্গচাপের পরিমাণ (sound pressure) এবং (২) ফ্রিকোয়েন্সি (frequency) অর্থাৎ তরঙ্গচাপ এক সেকেণ্ডে কতবার হচ্ছে।

শব্দদূষণ (sound pollutin) অর্থাৎ যখন সমস্ত শব্দের মিলিত প্রভাব জনজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে ও যন্ত্রনা দায়ক হয়ে ওঠে তখন তার প্রভাব মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত করতে বাধ্য। শব্দদূষণের মনের ওপর কী প্রভাব বিস্তার করে তাই এবার দেখে নেওয়া যাক।

১। **মানসিক চাপ বাড়ে :** অতিরিক্ত শব্দ মানসিক চাপ (stress) বাড়িয়ে দেয়। যখন কোনও মানুষ প্রবল শব্দ সমুদ্রে হাবুডুবু খায় তখন স্বাভাবিক ভাবে শারীরিক অস্বস্তির কারণে তার মধ্যে বিরক্তি (irritation) জন্মায়। বিরক্তি ও মানসিক ক্লান্তির কারণে ধৈর্যের অভাবও অবধারিত। তাই অতিরিক্ত শব্দ শরীরের স্তর থেকে মানসিক স্তরকে প্রভাবিত করে ও ফলত ব্যবহারিক আচরণেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। মানুষের সঠিক বিচার ক্ষমতা প্রভাবিত হয় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠাণ্ডা মাথায় যথাযথ আচরণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

২। **উদ্বেগ বাড়ে :** অতিরিক্ত শব্দ মানুষের মধ্যে অযথা উদ্বেগ তৈরি করে। মানসিক চাপ বৃদ্ধির ফলে রক্তচাপ (high blood pressure) বাড়ে। ফলে উদ্বেগজনিত সমস্যা দেখা যায়।যেমন-অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যাওয়া, বিপদের আশঙ্কা করার অভ্যাস, গলা শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। জোর শব্দে আমরা চমকে উঠি কেন? কারণ জোর শব্দকে বিপদের সঙ্কেত বলে প্রত্যক্ষ করা হয় ও স্বাভাবিক ভাবেই সেই বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য বা বিপদ থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য আমাদের শরীরে বিভিন্ন স্নায়ু ও হরমোনের ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়ে যায়। অবশ্য তা ক্ষণস্থায়ী হলে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই বিপদ সঙ্কেত বারবার আসতে থাকলে শারীরিক পরিবর্তনগুলো বারবার হতে থাকে ও তার একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব আমাদের শরীরে, মনে ও ব্যক্তিত্বে পড়তে বাধ্য।

৩। **রাগ বাড়ে :** অতিরিক্ত শব্দের ফলে মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না অর্থাৎ একাগ্রতা নষ্ট হয়। মানসিক চাপ বৃদ্ধির ফলে সহ্যক্ষমতাও কমে আসে। তাই অল্পেই রাগ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। স্বভাবতই রাগের বহিঃপ্রকাশ ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে নানা ভাবে পড়তে থাকে। পারিবারিক জীবনে বা কর্ম জীবনে যখন অন্য মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয় তখন সামান্য কারণে রেগে যাওয়ার ফলে পরিস্থিতি ও পরিবেশ জটিল হয়ে পড়ে ও অনেক ক্ষেত্রেই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। অথচ আমরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি না বিরাট শব্দব্যোম কীভাবে 'নিঃশব্দে' আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রবেশ করে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছে।

৪। **সামাজিক আচরণ ব্যহত হয় :** পরীক্ষায় দেখা গেছে শব্দমাত্রা ৪০ ডেসিবেলের বেশি হলে তার প্রভাব মানুষের সামাজিক আচরণের ওপরও পড়ে। সামাজিক আচরণ বদলে যায়। যে মানুষটার অন্য মানুষকে সাহায্য করবার প্রবণতা ছিল, তার পরিবর্তন হয়। সাহায্য করার প্রবণতা হ্রাস পায় ও রূঢ় আচরণের অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়।

৫। **মানসিক রোগ বৃদ্ধি পায় :** শব্দদূষণ সরাসরি মানসিক রোগের কারণ না হলেও মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে শব্দদূষণ ক্ষতিকর। বিষাদ রোগ (depression), উদ্বেগ জনিত অসুখ (Anxiety related disorders),

গভীর মানসিক অসুখ যেমন স্কিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia), প্যারানোইয়া (Paranoia) বা মুড্ ডিসঅর্ডার (Mood Disorder) ইত্যাদি অসুখে বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। সচরাচর এই অসুখগুলোতে ঘুম ভীষণভাবে ব্যহত হয় এবং স্নায়বিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। বিষাদ রোগে যেমন এনার্জি কমে আসে, মনে বিভিন্ন রকম খারাপ চিন্তা আসে, ওজন হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়, খিদে ও ঘুম কমে বা বাড়ে। অর্থাৎ শরীরের স্বাভাবিক সমতা ও মানসিক সমতাও বিঘ্নিত হয়। তাই এই অসুখে ভুগছেন এমন মানুষ অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই তার রোগের উপসর্গ আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ মানসিক চাপ বাড়লে বিষাদ রোগে প্রবল ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এমন কী রোগী আত্মহননের মতো মারাত্মক পদক্ষেপ করতে পারেন।

আগেই বলা হয়েছে, আতরিক্ত শব্দের ফলে মানুষের উদ্বেগ বাড়ে কারণ, তাঁর মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। স্বভাবতই উদ্বেগজনিত অসুখে ভুগছেন এমন মানুষের ক্ষেত্রে তা উদ্বেগবৃদ্ধিকর উপাদান হিসাবেই কাজ করে ও রোগের বিভিন্ন উপসর্গ যেমন, ঘুম না হওয়া, হাইপারটেনশন ইত্যাদি বেড়ে যায়।

এগুলো তো গেল নিউরোটিক অসুখ যা ওষুধ খেয়ে ও সাইকোথেরাপির মাধ্যমে সারানো সম্ভব। কিন্তু সাইকোটিক অসুখ যেমন প্যারানোইয়া (Paranoia), স্কিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia), মুড ডিসঅর্ডার (Mood Disorder) ইত্যাদি অসুখ এমনিতেই পুরোপুরি সারার সম্ভাবনা কম। এই অসুখগুলোতে রোগীর বিচারক্ষমতা (Judgement), অসুখ সম্বন্ধে সচেতনতা (Insight) এমনিতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া এই সব মানসিক অসুখে আক্রান্ত মানুষের এনার্জি লেভেল অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় এবং এদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা অনেক ক্ষেত্রে বেশ আয়াসসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই এই সব রোগীকে অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে রাখলে ও তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেলে ভয়ানক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা যায়।

মানসিক রোগের ওপর শব্দ দূষণের প্রভাব সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতি ডেকে আনে।

পরিশেষে বলা যায়, শব্দ দূষণের প্রভাব সুদূর প্রসারী। শরীরের নানা অসুখ যেমন হার্টের অসুখ, আলসার, নার্ভাস সিস্টেমের অসুখ অতিরিক্ত শব্দ দূষণের ফলে দেখা যায়। শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব মানুষের মনে ব্যবহারে, শরীরে, সামাজিক জীবনে যে ভাবে পড়ছে তার সম্বন্ধে ধারণা আজও খুব পরিষ্কার নয়। তাই আজকের শহুরে জীবনযাত্রায় হার্টের অসুখ, মনের অসুখ, আচরণগত বিভিন্ন সমস্যা ও মানসিক চাপজনিত সমস্যায় নাজেহাল মানুষ ভেবে পায় না কী ভাবে এসবের থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি আমরা সচেতন হই ও অযথা ক্ষতিকর শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন করা থেকে বিরত থাকি তবে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে বাধ্য।

লেখক পরিচিতি : রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট) ও প্রাবন্ধিক। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

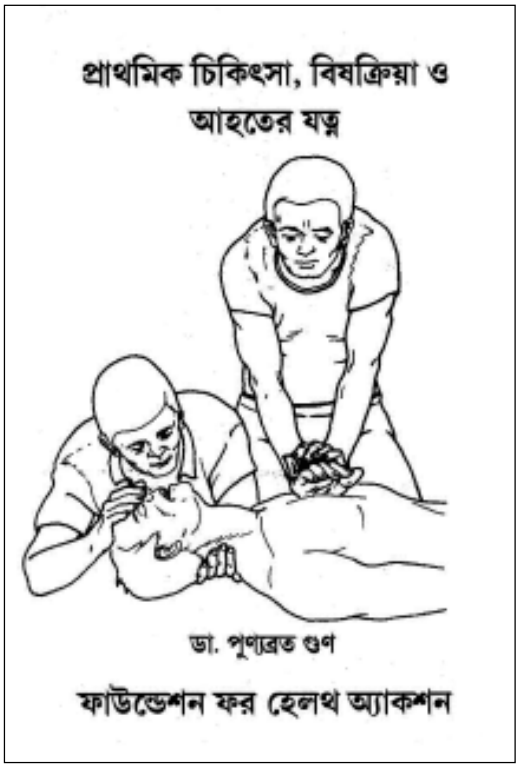

প্রকাশিত হয়েছে

ফাউন্ডেশান ফর হেলথ অ্যাকশান-এর প্রকাশনা

প্রাথমিক চিকিৎসা, বিষক্রিয়া ও আহতের যত্ন

অনুবাদ : ডা. পুণ্যব্রত গুণ

মূল্য ১০০ টাকা

কপির জন্যে যোগাযোগ :
ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত
ফোন : ০৯৮৩১১ ০০৪৬৪

বঙ্গে আর্সেনিক

প্রধানত মাটির তলা থেকে তোলা নলকূপের জলের মাধ্যমে পূর্ব-পশ্চিম এই দুই বাংলাতেই ছড়িয়ে পড়ছে মারণ বিষ আর্সেনিক। দীর্ঘকালীন স্বল্প মাত্রার আর্সেনিকের ক্রিয়ায় মানুষ অথর্ব হয়ে যাচ্ছে, মারা পড়ছে দু-বঙ্গেই, এবং কোনও দিকেই সরকারি প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। কেন হল এই মহামারী? কী তার লক্ষণ? কারা আক্রান্ত হয়েছে। আর কারা আক্রমণের শিকার হতে চলেছে? চিকিৎসা কী? প্রতিকারই বা কী? বিশ্বের এই বৃহত্তম গণ-বিষ প্রয়োগের কাহিনি লিখছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস**।

'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাঙলায়
হয়তো বা শঙ্খচিল, হয়তো বা শালিখের বেশে
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে...'

কার লেখা বলে দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু এ লেখা পড়লেই, এমনকী শুনলেই অথবা পংক্তিগুলো মনে পড়লেই যেন মনে হয় খালি গায়ে গড়াগড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি বাংলার মাটি মেখে। শুয়ে থাকি সেই আলের ওপরে-যার দু'পাশে জলা ধানের জমি, যেখানে মাছ খেলা করে ট্যানটেনে মাছ। যারা এগুলো দেখেনি, অথচ বাংলায় বাস করেন তাদের মতো দুর্ভাগা নেই দু'টি। আবার অন্য ভাবে ভাবলে তাদের মতো সুখীও কেউ নয়—কারণ তাদের দায় পড়ে না আবার ফিরে আসার। তাদের দায় পড়ে না ঘাসের ওপর ফড়িং দেখার। তাদের দায় পড়ে না কচি ধান পাতার সোঁদা গন্ধ বুক ভরে নেওয়ার। তাই তাদের দুঃখও নেই।

কিন্তু আমাদের মতো কেউ কেউ আছে, যাদের ধানসিড়ি বা ঘোড়াখালি সব নদীই বুক ভরে থাকে, তাদের উজান ভাটি সারা মনে খেলা করে। তাদের কাছে সত্যিই মনে হয়—

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর;'

কিন্তু সেই বাংলার আজ বড় দুঃসময়।

একটু খুলে বলা যাক। চলুন যাই 'সামতা' গ্রামে। ধানসিড়ির মতো 'বেত্না' বয়ে চলেছে যার পাশ দিয়ে। জীবনানন্দের বাংলা, জসীমউদ্দিনের বাংলা আর সেই বাংলার এক ছোট্ট গ্রাম সামতা। ছায়া সুনিবিড়। শান্তির নীড়। বেতনা তার সামতাকে নিয়ে বেশ ছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে সব কিছু কেমন যেন পাল্টাতে লাগল। হঠাৎ করেই যেন কোনও দুষ্ট পিশাচ ভর করলো সামতার ওপর। কী এক মারণ রোগে কয়েক বছরের মধ্যেই আক্রান্ত হল সামতার ৯৭ শতাংশ লোক। সে গ্রামের নাম শুনলে লোকে নমস্কার করে কপালে হাত ঠেকায়। তার পাশ দিয়ে কেউ যেতে চায় না। সেখানকার মেয়েদের বিয়েও হয় না অন্য গ্রামে। দূরদূরান্তের আত্মীয়স্বজনেরাও ত্যাগ করেছে সামতাকে। অভিশাপে সামতা আজ ঘুমন্ত প্রেতপুরীর মতো। নিঃসঙ্গ, নিঃসহায়। আল্লাহ বা ভগবানের ওপর সেখানকার লোক আজ ভাগ্যকে সঁপে দিয়ে ভাগ্যহীন হয়ে প্রহর গুনছে।

কিন্তু কার বিষাক্ত নিশ্বাসে আজ সামতার এই জরা? কুষ্ঠ রোগের মতো সারা গায়ে, হাতে, পায়ের চামড়ায় ছোপ, ঘা বা অন্য উপসর্গ? কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কেউ। অবশেষে সেই অভিশাপের কারণ খুঁজে পাওয়া গেল—আর্সেনিক। যার নাম আমরা আগে শুনেছি, কিন্তু এরকম অভিশাপের কারণ হিসাবে নয়।

কী এই আর্সেনিক?

আর্সেনিক। এক ধরনের মৌলিক পদার্থ, যা সাধারণত জলে থাকে। আমাদের শরীরের জন্য যে সব মৌলিক পদার্থ দরকার হয়, তার মধ্যে আর্সেনিক অন্যতম। আর্সেনিকের অভাবে শরীরে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ইনফার্টিলিটি বা সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়। শরীরের দৈনিক আর্সেনিকের চাহিদা ১ মিলিগ্রামের কম, তাই একে *আল্ট্রা ট্রেস এলিমেন্ট* বলে।

প্রকৃতিতে কী ভাবে আর্সেনিক পাওয়া যায়?

প্রকৃতিতে আর্সেনিক স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায়। এর উৎসকে আমরা তিন ভাবে ভাগ করতে পারি—

১। **প্রাকৃতিক :** আর্সেনিক মাটিতে পাথরের সঙ্গে বা অন্য আরও কিছু যৌগের সঙ্গে মিশে থাকে। জলের সঙ্গেও দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। জল যখন আর্সেনিক যুক্ত পাথরের বা পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে চলে, তখন তাতে আর্সেনিক যুক্ত হয়। সেই জল মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক।

- আবার কোনও খনিজ তেল বা জীবাশ্ম যখন জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন আর্সেনিক প্রকৃতিতে মেশে।
- আগ্নেয়গিরি থেকেও আর্সেনিক নির্গত হয়ে প্রকৃতিতে যুক্ত হয়।

২। কল-কারখানার থেকেও যথেষ্ট পরিমাণ আর্সেনিক প্রকৃতিতে মেশে। এর মধ্যে ধাতু গলানো কারখানা (smelting industries), মাইক্রোইলেকট্রনিক্স (Gallium arsenite) কাঠের কাজে, রঙে, কারখানার বর্জ্য পদার্থে, কয়লা খনি থেকে এবং কাঁচের কারখানা থেকে আর্সেনিক প্রকৃতিতে মেশে। প্লাইউড কারখানায় থেকেও আর্সেনিক মেশে। বিভিন্ন পেস্টিসাইডে বা সারের সঙ্গেও আর্সেনিক থাকে।

৩। **ওষুধ সংক্রান্ত :** ইতিহাস বলে, ২৫০০ বছর আগে আর্সেনিক মেডিসিন হিসাবে ব্যবহৃত হত। এমনকী, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আর্সেনিক বিভিন্ন রোগের নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হতো। যেমন ডায়রিয়া, ব্রণ, হাঁপানি, ম্যালেরিয়া, একজিমা, বাতের ব্যথা ইত্যাদিতে। সে ইতিহাসে পরে আসব।

এ ছাড়া, বিভিন্ন হারবাল প্রোডাক্টে এবং হোমিওপ্যাথিক ওষুধেও আর্সেনিক থাকে।

এতদিন কোথায় ছিল?

অর্থাৎ দেখা গেল, প্রকৃতিতে আর্সেনিক থাকে। কিন্তু এতদিন আর্সেনিকের বিপদ ছিল না। তা হলে নতুন করে কোথা থেকে কেন এই বিপদ এল? হঠাৎ কি পৃথিবীতে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে গেল, যে এখন হৈ হৈ রৈ রৈ রব উঠেছে? আর বাড়লই বা কেন? এরকম অনেক প্রশ্ন ধাওয়া করলো বিজ্ঞানীদের। তাঁরা উত্তর খুঁজলেন। অনেকগুলো সম্ভাব্য কারণও পাওয়া গেল। এর মধ্যে দু' একটা নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা হল।

আর্সেনিক ভূ-ত্বকের স্বাভাবিক অঙ্গ বা অংশ। আর্সেনিক মাটিতে প্রধানত আয়রন পাইরাইটের যৌগ অবস্থায় থাকে। এই যৌগের বিয়োজনের ফলে আর্সেনিক জলের সঙ্গে মিশতে পারে। এছাড়া, আয়রন অক্সিহাইড্রক্সাইড মাটির মুক্ত আর্সেনিককে ধরে রাখে, এবং এর বিজারণ হলে আর্সেনিক মুক্ত হয়ে জলে মেশে।

গাঙ্গেয় উপকূলে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের নীচের ভূ-ত্বকে প্রচুর পরিমান আর্সেনিক যুক্ত পাইরাইট আছে। কোনও কারণে এই খনিজ ও আকরিকের রাসায়নিক বিক্রিয়া বা জারণ-বিজারণের ফলে আর্সেনিক মুক্ত হয়ে জলে মেশে বা জলে দ্রবীভূত হয়।

নানা রকমের অজৈব যৌগের মধ্যে আর্সেনিক থাকে। কিন্তু পানীয় জলে দ্রবণীয় আর্সেনিক সাধারণত ৩ যোজ্যতার আর্সেনাইট (Trivalent Arsenite-As III) বা ৫ যোজ্যতার আর্সেনেট (Pentavalent Arsenate-AsV) হিসাবে থাকে।

জৈব আর্সেনিক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বিভিন্ন সামুদ্রিক খাদ্যে, কিন্তু সেগুলো শরীরের বিশেষ ক্ষতি করে না।

বোঝা গেল, আর্সেনিক নতুন নয়। নতুন হল প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক জলের সঙ্গে মেশা। কিন্তু কেন, কী এর সম্ভাব্য কারণ? হঠাৎ করে কেন জলের সঙ্গে উঠতে শুরু করলো কিলো কিলো আর্সেনিক? এতদিন তা হলে এই আর্সেনিক এত পরিমাণে জলের সঙ্গে ওপরে আসেনি কেন? না কি এসেছে আমরা জানি না?

আত্মঘাতী বাঙালি?

১৯৭০ সাল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল হল। বাঙালি জাতির একাংশ জেগে উঠল, কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল আকাশে-বাতাসে 'আমারে দাবায়ে রাখতে পারব না'। শেখ মুজিব বিপুল ভোটে জিতলেন, কিন্তু শাসনভার দেওয়া হল না বাঙালি মুজিবর রহমানকে। অবশেষে একাত্তরের (১৯৭১) রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৫০ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশের জন্ম হল।

জন্ম হল বাংলাদেশ নামক এক নিঃস্ব ক্ষুধা পীড়িত অপুষ্ট দেশের। যুদ্ধ তার সঙ্গে বয়ে আনলো দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আন্ত্রিক ইত্যাদি। যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের অনেক প্রাণ কেড়ে নিল আন্ত্রিক।

আর এই আন্ত্রিক থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্তি দিতে এগিয়ে এল অসংখ্য বিদেশি সংস্থা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), UNICEF এবং আরও অনেকে। তারা বাঙালি জাতিকে পরিশুদ্ধ জল জোগানোর দায়িত্ব নিল। পরিকল্পনা নেওয়া হল অনেক নলকূপ বা টিউবওয়েল বসানোর। পুকুরের জল ব্যবহার না করে টিউবওয়েল বসানো হয়ে গেল। সম্পূর্ণ কাজটা হল British Geological Survey (BGS)-এর তত্ত্বাবধানে। তাদের ওপরে শুধু টিউবওয়েল বসানোর দায়িত্বই ছিল না, দায়িত্ব ছিল কেমন জল বেরোচ্ছে তা নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করে দেখারও। তারা সে দায়িত্ব পালনও করেছে, একবার দু'বার নয়, তিন তিন বার।

সেই ১৯৭৮ সালের পর থেকে কয়েক বছর পরে পরে। কিন্তু বাঙালির কপাল পোড়া—BGS আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করেনি। এটা কি ইচ্ছে করে না অনিচ্ছাকৃত? ঘটনা যাই হোক, সেই একই সংস্থা ওই একই সময়ে লন্ডন শহরে জলের নমুনা পরীক্ষা করে। সেখানে কিন্তু তারা আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করেছিল। অর্থাৎ তারা বাঙালির পানীয় জলকে কোনও গুরুত্বই দেয়নি বলা যায়। আজ বাঙালি জাতির এই চরম বিপর্যয়ের মূলে এই ঘটনাকেই দায়ী করা হচ্ছে। কিন্তু আর্সেনিক বাড়লো কী ভাবে? বিজ্ঞানীদের বক্তব্য এর মূলেও ওই ১২ লক্ষ টিউবওয়েল। একসঙ্গে এত টিউবওয়েল মাটির নীচ থেকে জল তুলতে লাগল। ভূত্বকে তৈরি হল শূন্যতা। ওপর থেকে হাওয়া ঢুকতে লাগল সেই শূন্যস্থানে। তার সঙ্গে থাকল অক্সিজেন। এই অক্সিজেন বিক্রিয়া করলো মাটির নীচে থেকে আর্সেনিক যুক্ত অন্যান্য যৌগের সঙ্গে। তার ফলেই মুক্ত হল আর্সেনিক, মিশলো গিয়ে জলের সঙ্গে। মানুষ সেই জল তুলে খেল। পরোক্ষে, বাঙালিকে বিশুদ্ধ জল দিতে গিয়ে বিষাক্ত জল উপহার দিল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা এত সব বুঝিনি। কিন্তু রাষ্ট্র আলাদা হলেও ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের এক। সুতরাং আমাদের জলেও আর্সেনিক মিশতে শুরু করলো। জল আমরাও কম তুলিনি ভূগর্ভ থেকে। তবে আমরা আমাদের নিজেদের টাকায় টিউবওয়েল বসিয়েছি। তাই আমাদের অবদানও কম নয়।

আর্সেনিক জলে এল। আমরা জল পান করতে শুরু করলাম। আমরা আমাদের অজান্তেই এই বিষ একটু একটু করে শরীরের মধ্য শুষে নিলাম।

আর্সেনিক এক ধরনের বিষ। এই বিষ হঠাৎ করে অনেকখানি খেয়ে নিলে কী হবে, সে সব বইতে লেখা আছে, তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু শরীরে যদি একটু একটু করে দীর্ঘদিন ধরে ঢোকে, তবে কী হবে, সে আমাদের প্রায় অজানা ছিল। কাজেই বাঙালির শরীরে স্লো পয়জনিং চলতে থাকল সেই ১৯৭০ সালের পর থেকে।

আর্সেনিক মানুষকে তিলে তিলে শেষ করে। সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক শরীরে ঢুকলে শরীরের ক্ষমতা তাকে নির্মূল করে দিতে পারে। কিন্তু বেশি পরিমাণ ঢুকলে তাকে নষ্ট করার ক্ষমতা শরীরের নেই। তাই একটু একটু করে আর্সেনিক শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে জমতে থাকে— যেমন চুলে, নখে, চামড়ায়। আরও বেশি দিন চলতে থাকলে শরীরের প্রায় সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই আর্সেনিক জমতে থাকে।

তারপর শুরু হয় শরীরের কল-কব্জা অকেজো হওয়ার কাজ। যা আর্সেনিক ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে করতে থাকে। অবশেষে এক সময় কিছু নির্দিষ্ট রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তারপরে হয়তো ক্যানসার... তারপরে মৃত্যু...।

ইতিহাসের পাতা থেকে

ইতিহাস কথা বলে। আসুন, একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখি আর্সেনিকোসিস কী বলছে ইতিহাসে।

১৮১৫ সালের ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটার পরে তাকে নির্বাসিত করা হয় ছোট্ট আগ্নেয়গিরিময় সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। সেখানে এক স্যাঁতসেঁতে বদ্ধ ঘরে ১৮২১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দেহ নিয়ে পরে অনেক গবেষণা চলে। নেপোলিয়নের চুলে আর্সেনিক পাওয়া যায়। বর্তমানে কারও কারও ধারণা, তাঁর মৃত্যুর অন্যতম কারণ আর্সেনিক। তার ঘরের দেওয়ালে ছিল Scheele's green নামক রঙে তৈরি ওয়াল পেপার। সেখানে ড্যাম্প ধরে ছত্রাকের সংক্রমণের ফলে সেই রঙ থেকে ধোঁয়ার আকারে বের হত আর্সেনিক। সেই আর্সেনিক বাতাসে মেশে। ফলে সেখানকার অধিবাসীরা আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়। নেপোলিয়ন ছাড়াও সেখানে আরও অনেকেই 'খারাপ হাওয়া' লেগে রোগাক্রান্ত হয়। তাদের উপসর্গ সেই পেটে ব্যথা, বমি, পা ফোলা ইত্যাদি। এমনকী নেপোলিয়নের সঙ্গী বাটলারও মারা যায়। তাই এক দলের মতে নেপোলিয়নই হয়তো আর্সেনিকের একজন প্রথম বলি।

১৮৮৮ সালে Hutchinson চামড়ার ক্যানসারে আক্রান্ত এক রোগীর ইতিহাস নিয়ে জেনেছিলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিকযুক্ত ওষুধ সেবন করেছিলেন।

১৯০৯ সালে আবিষ্কার হয় আর্সেনিকযুক্ত যৌগ Arsphenamine। ১৯৪০ সালে পেনিসিলিন আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এটাই ছিল সিফিলিসের চিকিৎসার প্রধান ওষুধ।

সামগ্রিক ইতিহাস :

১৯৬৫-র সমীক্ষায়, ৬-২৬ বছর ধরে Fowler's solution ব্যবহারকারীদের মধ্যে আর্সেনিক্যাল কেরাটোসিস ও চামড়ার ক্যানসার ধরা পড়ে।

১৯৬৮ সালে তাইওয়ানে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, আর্সেনিক কবলিত এলাকায় চামড়ার রঙের পরিবর্তন (Hyperpigmentation) হয়েছে ১৮.৪% মানুষের, আর্সেনিক্যাল কেরাটোসিস পাওয়া যায় ৭.১% লোকের, আর চামড়ার ক্যানসার পাওয়া যায় ০.৫% লোকের মধ্যে। দেখা যায় এর সঙ্গে বেশি আর্সেনিক যুক্ত জল পান করার সম্পর্ক আছে।

১৯৭৪ সালে দেখা যায় (দত্ত ও কল) সুপার ফসফেট সারে আর্সেনিকের পরিমাণ ১৮৭.৮ মিলিগ্রাম / ১০০ গ্রামে।

১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পানীয় জলে আর্সেনিক পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর নথিভুক্ত হয় ১৯৮৩ সালে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে। তার আগেই এই লক্ষণ নিয়ে অনেকে এলেও সেটা যে আর্সেনিকের জন্য, সে তথ্য অজানা ছিল।

১৯৮৮ সালে সার্ভে করে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের ৬টা জেলা আর্সেনিকে আক্রান্ত।

১৯৯৪ সালের হিসাবে আক্রান্ত ব্লকের সংখ্যা ৩৭। ৩৪০০ স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে প্রায় ৩ কোটি লোক আর্সেনিক কবলিত এলাকায় বাস করত।

১৯৯৮ সালের হিসাব অনুযায় আক্রান্ত ব্লকের সংখ্যা ৬৯। আক্রান্ত জেলার সংখ্যা ৮। আর্সেনিক কবলিত এলাকায় বাস করত ৪ কোটি লোক। প্রতি বছর ২০ লাখ লোক নতুন করে এর আওতায় আসতে থাকে।

২০০৬ সালের হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গের মোট আক্রান্ত ব্লকের সংখ্যা ১১১। ১৯টা জেলার মধ্যে ৯টা জেলা তীব্রভাবে আক্রান্ত, ৫টা অল্প আক্রান্ত, ৫টা আর্সেনিক মুক্ত। SOES (স্কুল অফ এনভায়োরনমেন্টাল স্টাডিজ) তাদের একটা গবেষণায় ১,৪০,১৫০টা পানীয় জলের স্যাম্পলের মধ্যে ৪৮.১ শতাংশে আর্সেনিকের মাত্রা পেয়েছে ১০ মাইক্রোগ্রামের চেয়ে বেশি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। আজকের হিসাবে এই সংখ্যা আরও বেশি ছাড়া কম হবে না। কোন্ কোন্ জেলা এবং ব্লক আক্রান্ত, সে তথ্য পরে দেব।

বাংলার পটচিত্র :

দেশ ভাগ বাঙালিকে দু'ভাগ করে দিয়েছে। একই বৃন্তে দু'টি কুসুম আর নেই। কিন্তু বাংলা যে এক। তাকে কোনও ধর্ম, কোনও ভৌগোলিক সীমানা আলাদা করতে পারে না, পারবে না। তারা যে আবদ্ধ রক্তের সম্পর্কে, নাড়ির যোগাযোগে। তাই আর্সেনিকও তাদের আলাদা করে দেখেনি, সে একই ভাবে আক্রমণ করেছে বাঙালিকে। তবুও আমরা একটু আলাদা ভাবে এদের নিয়ে আলোচনায় আসব।

এই দুই দেশের ১৩০ মিলিয়ন লোক বর্তমানে আর্সেনিক কবলিত এলাকায় বাস করছেন। আর পশ্চিমবঙ্গের ৩৮,৮৬৫ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ৪২.৭ মিলিয়ন লোক আজ বিপদের সম্মুখে। এই এলাকায় আর্সেনিকের প্রভাব বিস্তার এবং তার ভবিষ্যত কী হতে পারে তা নিয়ে মত ব্যক্ত করেছেন প্রফেসর অ্যালান স্মিথ। তিনি বলেছেন—"The largest mass poisoning of a population in history is now underway in Bangladesh and India. It is a terrible public catastrophe".— Allan H. Smith, Professor of Epidemiology, University of California. WHO Consultant.

বাংলাদেশের অবস্থা :

বাংলাদেশের ৬৪টা জেলার মধ্যে ৫০টা জেলা তীব্রভাবে আক্রান্ত। সাড়ে ১২ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত জেলায় বাস করে (২০০৬ সালের হিসাব)। আর বাংলাদেশের মোট আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ৬ শতাংশের বেশি হল শিশু, অর্থাৎ তারা হয় বাল্যকাল থেকে অথবা জন্মের আগে থেকেই আর্সেনিকে আক্রান্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশে আর্সেনিকের ভয়াবহতা অনেক বেশি। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অনুকূল ছিল না। তা ছাড়া, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারে এগিয়ে থাকলেও আর্সেনিক নিয়ে তাদের যেন গা ছাড়া ভাব ছিল। সরকারও আর্সেনিকের ভয়াবহতাকে প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি। যদিও ১৯৮৫ সালে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকার এদিকে নজর দেয়। ততদিনে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে।

সেও এক কাহিনি। পশ্চিমবঙ্গে তখন আর্সেনিক থেকে হওয়া চর্ম রোগ ধরা পড়েছে। দিন দিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ (SOES) সবাই তখন পরীক্ষা চালাচ্ছে এর ব্যাপকতা ও উৎস খুঁজতে। সেরকমই এক সময়ে ১৯৯২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. দীপঙ্কর চক্রবর্তীরা দেখলেন, এক গ্রামের এক মহিলার রোগের কারণ আর্সেনিক। অথচ তাদের বাড়িতে অন্য কারও এই রোগ নেই। এমনকী আশে পাশেও কারও নেই। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মহিলার বাবার বাড়ি বাংলাদেশে। সেখানে তাদের বাড়ির এবং আশেপাশের অনেকেরই এই ধরনের চর্মরোগ আছে। সেখানে সবাই বলছে এটা কুষ্ঠ রোগ। দীপঙ্কর চক্রবর্তী বাংলাদেশে গিয়েও জল পরীক্ষা করলেন, দেখলেন এবং দেখালেন এ রোগের কারণ আর্সেনিক।

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৩ সালে আর্সেনিক সম্পর্কে সতর্ক হল, মেনে নিল এর ভয়াবহতা। ১৯৯৩ সালের আগে বাংলাদেশের কোনও জলেই আর্সেনিকের পরিমাণ মাপা হয়নি। আরও অনেক দিন পরে ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের কথা স্বীকার করে নিল এবং সহযোগিতার আশ্বাস দিল।

সহযোগিতা, কিন্তু কী ভাবে? World Bank তিন বছরের একটা জরুরি পরিকল্পনা নিল, যাতে সব টিউবওয়েল পরীক্ষা করে দেখা যায় কোথায় কোনও জলে কতটা আর্সেনিক আছে। কিন্তু দু' বছর পরে দেখা গেল ৬৮০০০ গ্রামের মধ্যে মাত্র ৮০০০ গ্রামের ২,৫০,০০০ টিউবওয়েলের জল পরীক্ষা হয়েছে। যেখানে মোট সংখ্যা ১২ লক্ষ। UNICEF এর মুখপাত্র সহিদা আফসারের বক্তব্য ছিল, 'এ রকম চললে আরও ৩০ বছর লাগবে জল পরীক্ষা করতে'। অর্থাৎ এক ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।

কিন্তু যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে, তার ফলাফল কী? দেখা গেল ৫৪ শতাংশ পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা বিপদ সীমার ওপরে।

বর্তমান (২০০৬ সালের হিসাব) বাংলাদেশের ১,১৮,৮৪৯ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১৮৯ ব্লকে ১০৪.৯ মিলিয়ন লোক আর্সেনিক কবলিত এলাকায় বাস করছে।

এর মধ্যে চর্মরোগে আক্রান্তের সংখ্যা অচিরেই ৯.৬ মিলিয়ন হবে বলে অনুমান।

প্রতিদিন ৩২ মিলিয়ন লোক লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক যুক্ত জল পান করছে। এই মন্তব্যেই বোঝা যায় বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা কী ''Bangladesh makes Chernobyl look like a sunday school picnic.''—Richard Wilson, Harvard University.

বাংলাদেশের কোনও কোনও জেলায় এত আর্সেনিক পাওয়া গেছে, যা ক্যুইজ মাষ্টারদের ক্যুইজের বিষয় হতে পারে। যেমন সামতা, যেমন 'শিলাদি'। শিলাদি গ্রামে ৭৩টা টিউবওয়েলের ৭২টাই আক্রান্ত, এবং অনেক বেশি মাত্রায়। তার মধ্যে ২১টাতে আর্সেনিকের বিশ্ব স্বাস্থ্য সস্থো নির্দেশিত মাত্রার ১০০ গুণ বেশি। সবচেয়ে বেশিটায় ৪০০ গুণ বেশি।

বিশ্বের মানচিত্র :

বর্তমান পৃথিবী কোথায় দাঁড়িয়ে? আর্সেনিক কোথায় কোথায় আক্রমণ করেছে, এবার একটু দেখে নিই।

২০০০ সালের আগে পর্যন্ত যে সব দেশে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিল, তা হল আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, চিলি, চিন, হাঙ্গেরি, ভারত (প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ), মেক্সিকো, পেরু, থাইল্যান্ড, এবং আমেরিকা।

২০০০ সালের পরে এসব দেশে আর্সেনিক তার প্রভাব ও প্রসার ঘটিয়েছে তো বটেই, তাছাড়া নতুন নতুন দেশকেও আক্রমণ করেছে। যোগ হয়েছে কম্বোডিয়া, লাওস, পাকিস্তান, মায়ানমার, ভিয়েতনাম ও নেপাল।

বেশি আক্রান্ত বাংলাদেশ, ভারত (প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ), চিন, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশ। এসব দেশে স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিয়েছে।

ভারতবর্ষের অবস্থা :

- বিহার : ১২টি জেলার ৩৯ ব্লক আর্সেনিক আক্রান্ত। সবচেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে যে জলে তার পরিমাণ ২১০০ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে। (থাকা উচিত ১০ মাইক্রোগ্রাম / লিটারের কম)।
- উত্তরপ্রদেশ : ৩টি জেলার ৯টা ব্লক আক্রান্ত। ১৪ জুলাই, ২০১৪ সালের টাইমস অফ ইন্ডিয়ার খবর অনুযায়ী, বর্তমান উত্তরপ্রদেশের ৩০টি জেলা আর্সেনিকের কবলে।
- অসমের ২টি জেলা আর্সেনিক কবলিত।
- ছত্তীসগড়ের একটি জেলা আক্রান্ত।
- ত্রিপুরারও বেশ কিছু এলাকা আর্সেনিক কবলিত। সোনামারা, বিশালগড় ও খোয়াই সাব ডিভিশনে প্রকোপ বেশি। আর্সেনিক ধরেছে দক্ষিণ ত্রিপুরার বেলোনিয়া ও উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশেশ্বরকেও।
- চণ্ডীগড়ে জলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ : এক ঘটমান মহামারীর পদক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৮ সালে মাত্র ৭টা গ্রাম আর্সেনিক কবলিত ছিল। ১৯৯৮ সালের হিসাবে, ৮টা জেলার ৬৯টা ব্লক আক্রান্ত ছিল। ২০০৬ সালের হিসাব আরও মারাত্মক। বর্তমান ১৪টি জেলার অনেকগুলো ব্লক আর্সেনিক কবলিত।

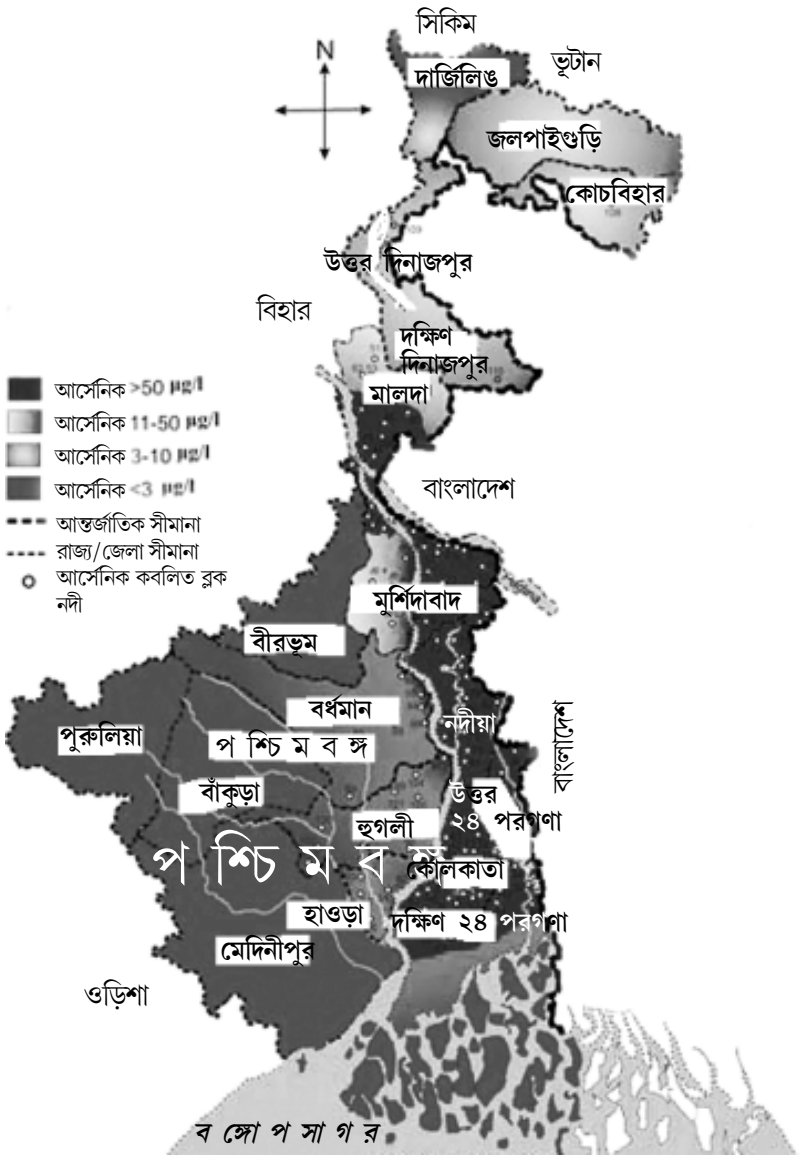

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক নিয়ে আরও কিছু তথ্য :

- মোট আক্রান্ত জেলা-১৪টি জেলা। ● তীব্র ভাবে আক্রান্ত-৯টি জেলা
- আর্সেনিকের মাত্রা অল্প - ৫টি জেলা

এই সব জেলায় যে জল পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে

- ১০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে : ৪৮.১% নমুনায়
- ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে : ২৩.৮% নমুনায়।

আমরা যারা কলকাতা বা আশে পাশে বসে নিশ্চিন্তে জীবন কাটাচ্ছি বা কাটাতে চাইছি, তাদেরও তাই নিশ্চিন্ত হওয়ার দিন বোধহয় ফুরলো।

মুর্শিদাবাদ : বহরমপুর, বেলডাঙা-২, ভগবানগোলা-১, সুতি-২, ভগবানগোলা-২, মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙা-১, শমশেরগঞ্জ, সুতি-২, কান্দি, রানিনগর-১, ভরতপুর-১, রানীনগর-২, সাগরদিঘি, ডোমকল, খড়গ্রাম, জলঙ্গি, হরিহরপাড়া, নোদা, রঘুনাথগঞ্জ-১, রঘুনাথগঞ্জ-২, ফারাক্কা, লালগোলা।

উত্তর ২৪ পরগণা : বারাসাত-১, বারাকপুর-১, দেগঙ্গা, রাণাঘাট, বসিরহাট-২, হিঙ্গলগঞ্জ, বাদুড়িয়া, মিনাখা, স্বরুপনগর, সন্দেশখালি-১, হাবড়া-১, হাবড়া-২, গাইঘাটা, বারাসাত-২, বসিরহাট-১, হাসানাবাদ, বনগাঁ, হাড়োয়া, আমডাঙ্গা, বারাকপুর-২।

মালদা : কালিয়াচক-১, কালিয়াচক-৩, কালিয়াচক-২, মানিকচক, ইংলিশবাজার, মালদা (ওল্ড), রতুয়া-১, চাচোল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা : বারুইপুর, জয়নগর, সোনারপুর, বজবজ-১, মগরাহাট-২, বিষ্ণুপুর-১, ভাঙড়-১, বিষ্ণুপুর-২,ভাঙড়-২, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, মগরাহাট-১।

নদীয়া : চাকদহ, হাঁসখালি, শান্তিপুর চাপড়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর-১, তেহট্ট-১, কৃষ্ণনগর-২, তেহট্ট-২, রাণাঘাট-১, হরিণঘাটা, কৃষ্ণগঞ্জ, কালিগঞ্জ, করিমপুর-১, করিমপুর-২, রাণাঘাট-২, নাকাশিপাড়া।

বর্ধমান : পূর্বস্থলী-১, পূর্বস্থলী-২, বর্ধমান-১, কালনা-১, কাটোয়া-১, মেমারী-২,রায়না-২।

হুগলী : বলাগড়, চণ্ডীতলা-১, চণ্ডীতলা-২, গোঘাট-১, হরিপাল, খানাকুল-১, খানাকুল-২, পান্ডুয়া, পোলবা-দাদপুর, সিঙ্গুর, শ্রীরামপুর।

কোচবিহার : কোচবিহার।

দক্ষিণ দিনাজপুর : বালুরঘাট।

উত্তর দিনাজপুর : গোয়ালপোখর-১।

কোলকাতা : দক্ষিণ কলকাতা

হাওড়া : বালি-জগাছা, উলুবেড়িয়া-২, সাকরাইল, আমতা-২, বাগনান-১, বাগনান-২, আমতা-১।

আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রা :

এবার কথা আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রা কত? এও আর এক গল্প।

১০০ বছরেরও বেশি আগেকার কথা। ১৯০০ সাল নাগাদ উইলিয়াম টমসন আর্সেনিকের মাত্রা ঠিক করলেন ১৫০ পিপিবি (parts per billion) পর্যন্ত স্বাভাবিক। মিলিগ্রামের হিসাবে ০.১৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। বা ১৫০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি লিটারে। উল্লেখ্য টমসন ডাক্তার ছিলেন না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নতুন করে নির্দেশিকা জারি করে বলল, না, নিরাপদ মাত্রা ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। এর বেশি থাকলে বিপদ। এক ঝটকার নিরাপদ মাত্রা কমে হল চার ভাগের এক ভাগ।

পরে দেখা গেল, এটাও নিরাপদ নয়। ১৯৯৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নতুন করে বলল—পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা কখনওই প্রতি লিটারে ০.০১ মিলিগ্রামের (বা ১০ মাইক্রোগ্রাম) বেশি হওয়া উচিত নয়। বেশি হলেই বিপদ।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের — বাংলাদেশ ও ভারতীয়দের। আমরা এখনও আমাদের নিরাপদ মাত্রা সেই ০.০৫ মিলিগ্রামে (বা ৫০ মাইক্রোগ্রামে) বেঁধে রেখেছি। আমাদের সরকার বলছেন, জলে প্রতি লিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম আর্সেনিক থাকলেও তা নিরাপদ। অথচ WHO বলছে ০.০১ মিলিগ্রাম। আমরা ৫ গুণ চড়িয়ে রেখেছি। সেটা কি সরকারি দায় এড়ানোর জন্য?

সরকার তার দায় এড়াতে পারে, আর্সেনিক কিন্তু তার কাজ করেই যায়। আগেই বলেছি, সে ধীরে ধীরে শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে। জমতে শুরু করে।

রোগের লক্ষণ :

শরীরে আর্সেনিক কী করে? আগেই বলা হয়েছে আর্সেনিক আমাদের দরকার। দৈনিক দরকার ৫০ মাইক্রোগ্রামের মতো। এর ৬৪% সংগ্রহ করা হয় জৈব আর্সেনিক থেকে, বাকিটা অজৈব যৌগ থেকে। আমাদের পাকস্থলী ও অন্ত্র সহজেই আর্সেনিক গ্রহণ করতে পারে। বেশি গৃহীত হলে আর্সেনিক শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে জমতে শুরু করে। অজৈব আর্সেনিক লিভারের দ্বারা মিথাইলেশান হয়ে (একটা বিপাকীয় ক্রিয়া) প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কোনও কারণে যদি আরও আর্সেনিক জমে, লিভার তাকে বের করতে পারে না, তখনই শরীরের অন্য অঙ্গে আর্সেনিক জমতে থাকে।

এই আর্সেনিক চামড়ার কোষের মধ্যের কেরাটিনকে পছন্দ করে, তাই সেখানে আগে জমে। তেমনি কেরাটিন যুক্ত নখ ও চুলেও জমে। তারপর ধীরে ধীরে লিভার, ফুসফুস, অন্যান্য অঙ্গেও জমে। কোষের মধ্যকার উৎসেচককে আর্সেনিক কাজ করতে বাধা দেয়। যেমন গ্লুটাথিয়ন অক্সিডেজ নামক দরকারি উৎসেচকের সেলেনিয়াম মৌলিক পদার্থকে সরিয়ে দিয়ে সেই স্থান দখল করে, ফলে উৎসেচক তার কার্যকারিতা হারায়। তার ফলে নানান রোগের সৃষ্টি হয়। প্রায় কমবেশি শরীরের সব তন্ত্রই আক্রান্ত হয়, কিন্তু বেশি আক্রান্ত হয় চর্ম বা skin।

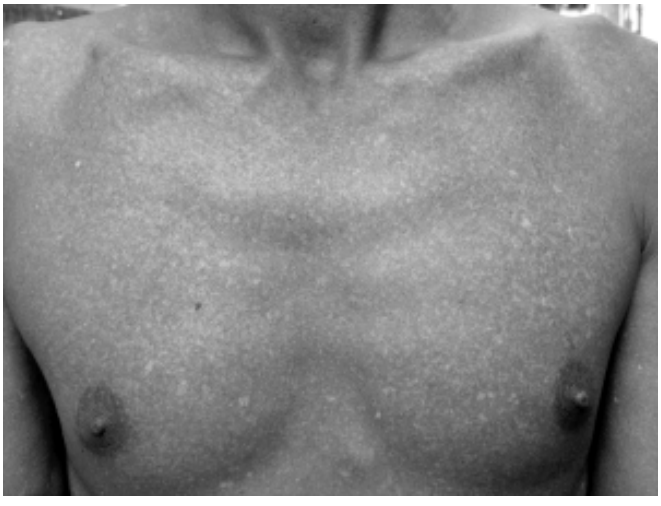

সত্যি কথা বলতে কী ডাক্তারেরাও এর আগে এ সব রোগ দেখেননি নি, তাই তাঁরাও জানতেন না যে দীর্ঘ দিন ধরে আর্সেনিক শরীরে জমলে কী রোগ বাসা বাঁধে। অন্যান্য রোগের থেকে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। যত দিন যাচ্ছে, ততই এ বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। তাই আজ যা বলছি, কাল অন্য রকম তথ্য পাওয়া যেতেই পারে।

ধরে নেওয়া যায়, ১৯৭০-৭১ সালের পর থেকে পানীয় জলে আর্সেনিক মিশতে শুরু করেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্বীকৃত রোগী ধরা পরে ১৯৮৩ সালে। অর্থাৎ প্রায় ১৩ বছর পর। আর বাংলাদেশে ১৯৮৮ সালে,

অর্থাৎ ১৭ বছর পর। কাজেই ধরে নেওয়া যায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে সময় লাগে ১০ বছরের বেশি। পরে দেখা গেছে এই সময়টা নির্ভর করে কে কতটা আর্সেনিক যুক্ত জল পান করছে তার ওপর। পরিমাণ অল্প থাকলে সময় বেশি লাগবে, পরিমাণ বেশি থাকলে সময় কম লাগবে।

প্রথম দিকে অনেক ডাক্তারই আর্সেনিকের চর্ম রোগকে কুষ্ঠরোগ বলে ভুল করেছিলেন। যখন দেখা গেল, না, রোগটা আর্সেনিকের জন্যই তখন আরও অনুসন্ধান চলল। পরীক্ষা চলল, দেখা গেল আর্সেনিকের মাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পেতে সময় লাগে ২-৫ বছর। তারপর একটু একটু করে অন্য উপসর্গ দেখা দেয়। সময় সারণী এরকম—

১। চর্ম রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ : ২-৫ বছর পরে।
২। চামড়া খসখসে হয়ে যাওয়া : ২.৫-৫ বছরে পরে।
৩। বাওয়েন ডিজিজ (Bowen's disease) : ১০ বা তার বেশি বছর পরে।
৪। চামড়ার ক্যানসার : ১৪-২৪ বছর পরে।

আর্সেনিক বিষণে কী কী রোগ হতে পারে?

চর্মরোগ :

১। **রঙের পরিবর্তন :** স্বাভাবিক রঙের বদলে চামড়া সাদা বা বেশি বাদামী হতে পারে। বৃষ্টির ফোঁটার মতো ছিটিয়ে চামড়ার অনেকটা এলাকা জুড়ে রঙের পরিবর্তন হয়। আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ এটাই। ৯০% এর বেশি রোগী এই উপসর্গ নিয়ে আসে।

২। **আর্সেনিক্যাল কেরাটোসিস :** আক্রান্ত চামড়া খসখসে হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। হাত পায়ের তালু, আঙুল, গোড়ালি, এবং শরীরের যে সব স্থান ঘর্ষণ প্রবণ, সেখানে এই রোগের প্রকাশ বেশি হয়। চামড়া তার স্থিতিস্থাপকতা হারায়, পেলবতা হারায়। সাধারণত পদ্মকাঁটার মতো বা আরও একটু বড় (২-১০ মিলিমিটার) আকারের শক্ত, হলদেটে বা কালচে উঁচু গুটির মতো হয়। হাতের তালু ও পায়ের তালুতে কেরাটোসিস হলে ব্যথা হয়, কেননা সেখানে ঘষা লাগে বেশি।

৩। **ক্যানসার :** চামড়ার ক্যানসার হতে কমপক্ষে ১০ বছর সময় লাগে। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের চামড়ার রঙের পরিবর্তন হয়েছে, তাদের মধ্যে ৯০% পরে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে। এই ক্যানসারের মধ্যে বেশি হয় যে ক্যানসার, ডাক্তারি ভাষায় তার নাম 'স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা'। এছাড়া বাওয়েনস ডিজিজ ও বেসাল সেল ক্যানসারও হতে পারে।

৪। অন্য রোগের মধ্যে হতে পারে পায়ের ফোলা বা ইডিমা, ইকথিওসিস বা চামড়া ফেটে যাওয়া, এবং চামড়ার কন্ট্রাকচার বা টান ধরা।

পেটের অসুখ : ১৪-১৭% রোগী পেটের অসুখের উপসর্গ নিয়ে হাজির হয়। লিভারকে নষ্ট করে দেয়। লিভারের যে রোগ বেশি হয় ডাক্তারি ভাষায় তার নাম Non-cirrhotic portal hypertension। এছাড়া লিভার বেড়েও যায়। লিভারের ক্যানসারও হতে পারে, লিভারের অ্যানজিওসারকোমা হতে পারে— তবে এগুলো বিরল।

এছাড়া পেটের আর যে সব উপসর্গ দেখা যায় তার মধ্যে আছে বমিভাব বা বমি, ডায়রিয়া, মুখ দিয়ে বেশি লালা পড়া, পেটের ব্যথা ইত্যাদি।

নার্ভের অসুখ :

প্রায় ২৪% লোকের এই উপসর্গ দেখা যায়। এর মধ্যে অনুভূতি কমে যাওয়া, রিফ্লেক্স কমে যাওয়া, পলিনিউরোপ্যাথি, সেরিব্রাল ইনফ্রাকশান ইত্যাদি হতে পারে।

মানসিক : রোগী অবশ্যই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে। তার বিষাদরোগ ও উদ্বেগ আসে। ঘুম কম হয়, অনেক কিছু ভুলে যাওয়া (Dementia), এ সব হতে পারে। মাংসপেশি দূর্বল ও কমজোরী হয়ে যেতে পারে।

হার্ট : হার্টের সমস্যা হতে পারে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। রক্তনালীগুলো সরু হয়ে যায়, হার্টের রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে, ফলে হার্ট অ্যাটাক (Myocardial infraction) হতে পারে। এছাড়া গ্যাংগ্রিনও (রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে শরীরের কোনও অংশ পচে যাওয়া) হতে পারে—তাইওয়ানে এই রোগ বেশি হয়।

ফুসফুস : কাশি, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়া, শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

চোখ : চোখ লাল হয়ে যাওয়া, জল পড়া, জোরালো আলোয় কষ্ট (photophobia) হতে পারে।

জননতন্ত্র : গর্ভবতী মায়েরা আক্রান্ত হলে তাদের শিশুর জন্মের ওজন কম হতে পারে। এছাড়া প্রিএকলামসিয়া, মৃত বা বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানোর হার বেড়ে যেতে পারে।

অন্যান্য : অন্য উপসর্গের মধ্যে কানে কম শোনা, আঙুলের নখ নষ্ট হয়ে যাওয়া আর নখে দাগ পড়ে যাওয়া ইত্যাদি হতে পারে। কিডনির সমস্যা, ইউরিনারি ব্লাডার ক্যানসার, ডায়াবেটিস ইত্যাদি হতে পারে।

এক সমীক্ষার হিসাবে, আর্সেনিক কে কতটা গ্রহণ করছে, তার ওপরে নির্ভর করে কতজন ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারে। প্রতিদিন ১ পিপিবি মাত্রার আর্সেনিক যুক্ত জল ২ লিটার করে পান করলে ভবিষ্যতে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা ৫০০০ জনের মধ্যে ১ জনের, আবার এই মাত্রা ৫০ পিপিবি হলে সম্ভাবনা বেড়ে হয় ১০০ জনের মধ্যে ১ জনের।

৫। ইউরিনারি ব্লাডার ক্যানসার : ১০-২০ বছর পরে।
৬। ফুসফুসের ক্যানসার : ৩০ বছর পরে।

অর্থাৎ শুরুটা চর্মরোগ দিয়ে হয়। পেটের গোলমাল হয় এর পরে। লিভারের অসুখ (Non-cirrhotic portal fibrosis), লিভারে ক্যানসারও হয়। রক্তের রোগ দেখা দিতে পারে। শরীরে রক্ত তৈরি কমে যেতে পারে। কাশি, রক্ত পড়া, ফুসফুসের ক্যানসার সবই হতে পারে। বিভিন্ন রোগের মাধ্যমে আর্সেনিক ধীরে ধীরে একটা জনবসতি বা জাতিকে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে তোলে। আজ বাঙালি জাতি সেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

কী করে বোঝা যাবে শরীর আর্সেনিকে আক্রান্ত ? (Biomarker)
বোঝার কতকগুলো উপায় আছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে আর্সেনিক জমে। সেই আর্সেনিকের পরিমাপ করে বোঝা যায় শরীরে কতটা আর্সেনিক জমেছে। একে বলে বায়োমার্কার। এগুলো হল :

১। **প্রস্রাবে আর্সেনিকের পরিমাণ** : স্বাভাবিক অবস্থায় আর্সেনিকের পরিমাণ প্রতি লিটার জলে ১০ মাইক্রোগ্রামের কম। জলে আর্সেনিক যদি ১০০ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে হয়, তবে প্রস্রাবে আর্সেনিকের পরিমাণ হয় ১৭৮ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে। আবার জলে আর্সেনিক যদি ৩১ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে হয়, তবে প্রস্রাবে আর্সেনিকের পরিমাণ হয় ৪১ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে। এ ভাবে একটা আন্দাজ করা যায়। তবে সামুদ্রিক খাবারে যেহেতু আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি থাকে, তাই সে খাবার খেলে প্রস্রাবে আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়ে। সেই খাবার কিন্তু দেহের সে রকম ক্ষতি করে না।

২। **চুল ও নখে** : চুলে স্বাভাবিক অবস্থায় আর্সেনিকের পরিমাণ ০.০২ মিলিগ্রাম / কেজিতে। পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় এই পরিমাণ ৩-১০ মিলিগ্রাম। যে সব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে লোকে আক্রান্ত হয়েছে সেখানে এই পরিমাণ ১০-১০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত পাওয়া গেছে। মারাত্মক ভাবে আক্রান্তদের শরীরে এর পরিমাণ ৪৫ মিলিগ্রামের বেশি। নখে স্বাভাবিক অবস্থায় আর্সেনিকের পরিমাণ ০.০২-০.৫ মিলিগ্রাম / কেজিতে। একবার মাত্র বেশি মাত্রায় আর্সেনিক খেলে সেই আর্সেনিক নখের ডগায় ১০০ দিন পরেও পাওয়া যায়।

৩। **রক্ত** : রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় আর্সেনিকের পরিমাণ প্রতি লিটারে ০.৩-২ মাইক্রোগ্রামের কম। ২০০ মিলিগ্রাম / লিটারে আর্সেনিক যুক্ত জল পান করলে এই পরিমাণ হয় ১০ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে।

৪। এছাড়া এই ভাবে ফুসফুসের, লিভারের ও চামড়ার আর্সেনিক নির্ণয় করেও একটা ধারণা পাওয়া যায়।

তবে এসব জানতে গেলে উপযুক্ত পরিকাঠামো যুক্ত জায়গার রক্ত, প্রস্রাব, স্কিন-বায়োপসি, নখ, চুল ইত্যাদির রাসায়নিক পরীক্ষা করাতে হবে।

রোগের চিকিৎসা কী?
সব চেয়ে বড়ো সমস্যা হল, অন্য সব রোগের চিকিৎসা থাকলেও আর্সেনিকে আক্রান্ত হওয়ার জন্য যে রোগগুলো হয়, সেই সব রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। এমন কোনও ওষুধ আবিষ্কার হয়নি, যা দিয়ে আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে সমস্ত আর্সেনিক বের করে দেওয়া যাবে। এটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার। তাই বর্তমান চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য রোগীকে কিছুটা আরাম দেওয়া, তার ভবিষ্যৎ রোগের প্রকোপ যতটা সম্ভব কমানো।

চামড়ায় কিছু মলম লাগিয়ে খসখসে ভাব দূর করা, ক্যানসার কোনও বিশেষ স্থানে হলে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া, বা অনেক সময় ক্রায়োসার্জারি করা হয়। আর রেটিনয়েড বা ফ্লুরোইউরাসিল ধরনের ওষুধ চামড়ার উপসর্গ কমাতে কিছুটা কাজে আসে।

তবে একটা জিনিস দেখা গেছে, ভাল খাবার খেলে রোগের উপসর্গ কম হয়। এজন্য আর্সেনিক কবলিত এলাকার মানুষের বেশি প্রোটিন ও ভিটামিন (বিশেষ করে ভিটামিন বি-১২) যুক্ত খাবার খাওয়া উচিত।

SPIRILUNA বলে এক প্রকার সামুদ্রিক না অ্যালগি (Algae) আছে, যা আর্সেনিকের চিকিৎসায় উপকারে আসে বলে দাবি, তবে এসব এখনও পরীক্ষানিরীক্ষার পর্যায়ে আছে।

মুক্তি কোথায় ?
তবে কি এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি নেই? এটাই এই মুহূর্তে লাখ টাকার প্রশ্ন। যেহেতু আর্সেনিকের রোগের কোনও নির্দিষ্ট ওষুধ নেই, তাই এখনও পর্যন্ত এর থেকে মুক্তিও নেই। এর থেকে বাঁচতে হলে নিরাপদ আর্সেনিক মুক্ত জল পান করতে হবে।

কিন্তু কোন্ জল নিরাপদ? আমরা যে সব উৎস থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারি, তার মধ্যে আছে—

১। **বৃষ্টির জল :** সবচেয়ে নিরাপদ জল। এতে কোনও আর্সেনিক থাকে না। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর বায়ুস্তর এতটাই কলুষিত, এই জল নীচে আসার সময় সেই সকল ধূলো বালি, গ্যাস, ময়লা ধরে নিয়ে আসে। তাকে শোধন করে পানযোগ্য করে পান করতে পারলে ভাল।

২। **নদী বা পুকুরের জল** (Surface water) : তুলনামূলকভাবে আর্সেনিক মুক্ত বা আর্সেনিকের পরিমাণ কম থাকে। নদী বা পুকুরের জল মাটির ওপরে থাকে। এই জল জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করলে নিরাপদ।

৩। **মাটির নীচের জল** : আমাদের এক প্রধান পানীয় জলের উৎস মাটির নীচের জল সাধারণ বা ডিপ টিউবওয়েল যাই হোক না কেন। আর এই জলই সবচেয়ে বিষাক্ত।

টিউবওয়েলের মাঝারি গভীরতার জল সবচেয়ে বিপজ্জনক। এক সমীক্ষায় বাংলাদেশে টিউবওয়েলের গভীরতা অনুযায়ী যে পরিমাণ আর্সেনিক ধরা পড়েছে, তা এরকম —

টিউবওয়েলের গভীরতা	আর্সেনিকের পরিমাণ
২১১ মিটার	৩০ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে
১৯৩ মিটার	২৫ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে
১০১ মিটার	৯৪ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে
৩৮ মিটার	১৭০ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে
২১ মিটার	১৮০ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে
২০ মিটার	১৬০ মাইক্রোগ্রাম / লিটারে

মনে রাখতে হবে, এক-এক স্থানের জলস্তর এক-এক রকমের। সর্বত্র একই গভীরতায় একই পরিমাণ আর্সেনিক পাওয়া যাবে, তা কিন্তু নয়। তবু মোটের ওপর বলা যায়, ২০০ মিটার বা ৬০০ ফুটের বেশি গভীরতার টিউবওয়েলের জল পান করা যেতে পারে। তাতেও WHO-র মাত্রার

ছোট আর্সেনিক ফিল্টার

বেশি আর্সেনিক থাকতে পারে। তাই মাটির নীচের জল পরীক্ষা না করে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

জল আর্সেনিক মুক্ত করার উপায় :

বর্তমানে তত্ত্বগত ভাবে ৪ ভাবে জল থেকে আর্সেনিক দূর করা যায়।

১। কিছু জারক পাদার্থ দ্বারা আর্সেনিকের জারণ ঘটালে সেই আর্সেনিক যৌগ থিতিয়ে পড়ে। তারপর ফিল্টারের সাহায্যে তাকে পৃথক করলে আর্সেনিক মুক্ত বা কম মাত্রার আর্সেনিক যুক্ত জল পাওয়া যায়।

২। অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন যুক্ত যৌগের মাধ্যমে আর্সেনিকের Adsorption ঘটিয়ে।

৩। আয়ন এক্সজেঞ্জ পদ্ধতির মাধ্যমে।

৪। অসমোসিস বা ইলেকট্রোডায়ালিসিস করে।

এসব প্রধানত তত্ত্বের দিক। বাস্তবে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। জল থেকে মুক্ত আর্সেনিক যে যৌগের মাধ্যমে বন্দি করে থিতিয়ে ফিল্টার করে বিশুদ্ধ জল বের করা হবে, সেই যৌগের মধ্যে তো আর্সেনিক থাকছে। তাকে কী করা হবে? মাটিতে ফেললে সে তো আবার মাটির মাধ্যমে জলে গিয়ে মিশবে, জলে আবার আর্সেনিক বাড়বে। আর এই ফিল্টারের ক্ষমতাও অসীম নয়, কিছু পরিমাণ জলকে বিশুদ্ধ করার পরে তার কাজের ক্ষমতা নষ্ট হবে, নতুন করে আবার তৈরি করতে হবে। তা ছাড়া বাড়ির ক্ষেত্রে এক রকম, আবার সরকারি ভাবে অনেক লোকের জন্য করলে অন্য রকম ভাবে করতে হবে। অন্য অনেক সরকারি কাজের মতো একবার বানিয়ে ছেড়ে দিলাম, আর কোনও রক্ষণাবেক্ষণ করা হল না, এরকম হলে কিছু দিন পরে কী হবে সেটা সহজেই অনুমেয়। তবে কিছুটা আশার আলো নিশ্চয়ই আছে। চারটি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে জলকে আর্সেনিক মুক্ত করার কাজে নেমেছে—

১। পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট : তারা বৃহত্তর ভাবে প্রথম পদ্ধতি অনুসরণ করে মালদা ও উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙাতে প্লান্ট বসিয়েছে। তত্ত্বগত ভাবে সফল হলেও বাস্তবে সেই জলের ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী কোনও অনুসন্ধান / সমীক্ষা হয়নি।

২। অল ইন্ডিয়া ইনইস্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ : তারা বৃহত্তর ভাবে এবং পারিবারিক ভাবে প্রথম পদ্ধতি অনুসরণ করে হাবড়া, দত্তপুকুর, বারাসাত, তেহট্ট এলাকায় কাজ শুরু করেছে। এক্ষেত্রেও তত্ত্বগতভাবে সফল হলেও বাস্তবে সেই জলের ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী কোনও অনুসন্ধান / সমীক্ষা হয়নি।

৩। বি.ই. কলেজ হাওড়া : তারা বৃহত্তর ভাবে এবং পারিবারিক ভাবে দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে উত্তর ২৪ পরগণা ও তেহট্ট এলাকায় কাজ শুরু করেছে। এখানেও তত্ত্বগত ভাবে সফল হলেও বাস্তবে সেই জলের ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী কোনও অনুসন্ধান / সমীক্ষা হয়নি।

৪। যাদবপুরের স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ, (CSIE, New Delhi এর সহযোগিতায়) : তারা ১৫০টা পরিবারের জন্য প্রথম পদ্ধতি অনুসরণ গাইঘাটা ও দেগঙ্গা ব্লকে (উত্তর ২৪ পরগণার) প্লান্ট বসিয়েছে। এঁদের পদ্ধতি একটু বিস্তৃত করে বলি

দুটো মাটির পাত্রের প্রথমটার নীচে ফিল্টার লাগিয়ে দ্বিতীয়টার ওপরে বসিয়ে দেওয়া হয়। ফিল্টারটা তৈরি করা হয় ফ্লাই-অ্যাশ, মাটি ও চারকোল মিশিয়ে। আলাদা ভাবে আয়রনের লবণ, জারক পদার্থ ও অ্যাকটিভেটেড চারকোল মিশিয়ে ট্যাবলেট বানানো হয়। একটা ট্যাবলেট ২০ লিটার জলে গুললে জল ট্যাবলেটের চারকোলের জন্যে কালো হয়ে যায়। এক ঘণ্টা পরে ওই জল ফিল্টারের ওপরের পাত্রে ঢালা হয়। তার পর সেখান থেকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার জল নীচের পাত্রে জমা হয়। প্রতিদিন একটা ট্যাবলেট ব্যবহার করে এভাবে ২০ লিটার জল শোধন করা যেতে পারে, যা ৪ জনের একটা পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট। তাদের দাবি, এতে ৯০-১০০% আর্সেনিক জল থেকে মুক্ত করা সম্ভব।

কিছু দিন পরে পরে ব্রাশ দিয়ে ফিল্টার পরিষ্কার করে সেই নোংরা জল মাটিতে গর্ত করে গোবরের মধ্যে ফেলতে হবে। তাদের দাবি, গোবরের ও মাটির জীবাণু সেই নোংরা আর্সেনিক যুক্ত জল থেকে আর্সেনিক মুক্ত করে গ্যাস তৈরি করে, যা বাতাসে মিশে যায়। মাটিতে থাকে না।

তবে যে কোনও প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করে তার কার্যকারিতা এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের ওপরে। বিভিন্ন এলাকার লোকের মনে বিভিন্ন সংস্কার থাকে, গোঁড়ামি থাকে। সে সব কাটিয়ে উঠে, সর্বত্র গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলেই আর্সেনিকের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এবং সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকলে তা কখনই সম্ভব হবে না। দুই বাংলা আজ এতটাই আক্রান্ত, এর ভয়াবহতা এবং আগামী দিনের কথা ভাবলে নিশ্চিত ভাবেই মনে হয় বাঙালি জাতির

অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। কারণ এর ব্যাপকতা আজ এত বেশি তা এই মন্তব্যে বোঝা যায় :

The number of people affected by this arsenic disester is among the greatest of any disease facing the world today. By virtue ifs sheer size it is pushing the limits of our knowledge and capacity to respond to it.'' Professor Van Ginkel, Rector of the United Nations University in Tokyo.

শুধুই কি জল?

বর্তমানে গঙ্গা-পদ্মা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের তীরের আশেপাশে জলে এবং মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ এতটাই বেশি যে সেই সব এলাকায় যে সব ফসল তৈরি হচ্ছে, তাতেও আর্সেনিক মিশছে। কাঁচা শাক-সবজিতে তো আছেই, সেখানকার ধান-চালেও অন্য জায়গার তুলনায় আর্সেনিকের পরিমাণ অনেকগুণ বেশি। গরু ছাগলেও সেই ঘাস বা ফসল খাচ্ছে, তাদের শরীরেও আর্সেনিক বাসা বাঁধছে। বাংলাদেশে গরুর দুধেও আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

বাঙালি জাতির ইতিহাস দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। ১৯০৫ সালে কার্জন বাংলাদেশকে দ্বিখন্ডিত করেছিল জাতিকে দূর্বল করার জন্য। তার ১০০ বছর পরে আর এক ঘাতক বাংলার সবুজ ধান খেতের মধ্যে শাপলা-শালুক ফোটা জলের মধ্যে লুকিয়ে আছে। একে দেখা যায় না। এ সামনে আসে না। একটা জাতিকে ধীরে ধীরে পঙ্গু, অসমর্থ করে তুলছে এই ঘাতক। ইতিহাস থেকে বাঙালি জাতিকে যেন মুছে দিতে এ তৎপর।

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলার জলে স্থলে আজ বিষের ধারা। এর নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে যে জলস্রোত তা বিষে ভরপুর। সেই বিষকে সে উগরে দিচ্ছে তার ধানে-চালে-শস্যে পানের বরজে। আর আমরা জেনে বা না জেনে অসহায়ের মতো তা শরীরে গ্রহণ করে চলেছি। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে এগিয়ে চলেছি সেই মৃত্যু উপত্যকার দিকে।

আমরা হয়তো আমাদের জীবন কাটিয়ে যাব কোনও নির্দিষ্ট উপসর্গ ছাড়া, কারণ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে অনেক দিন লাগে, কিন্তু আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্যে এ কোন্ ভূমি আমরা রেখে যাচ্ছি? কোন্ বাসযোগ্য পৃথিবী? আমরা কেউ কি আর নিশ্চিন্ত ভাবে মনের কথা বলতে পারবো।

'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাঙলায়' নাকি লোকে-কবি বিজয় সরকারের সুরে বলতে হবে—
'বুঝি জনমের শেষ দেখা রে, দেশের মাটি শেষের প্রণাম নিও...'

সমস্ত জল থেকে আর্সেনিক দূর করার এখনও কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি হয়নি। আবিষ্কার হয়নি আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগের নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ। বিশ্বব্যাপী তাই চলছে গবেষণা, সাধনা। আসুন আমরাও সেই সাধনার সামিল হই। আমাদের বঙ্গভূমি বিষমুক্ত হোক, রোগমুক্তি ঘটুক। তখন আবার প্রাণ খুলে জীবনানন্দ দাশের মতো বলবো—

'তোমার যেখানে সাধ চলে যাও- আমি এই বাঙলার পরে
রয়ে যাবো...

লেখক পরিচিতি : ডা. স্বপন বিশ্বাস, ডিসিএইচ, এমডি, শিশু বিশেষজ্ঞ। একটা সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার

বারবার হাত ধুচ্ছে নিজের, বারবার ধুয়ে ফেলছে বাসনকোসন, টেবিল-চেয়ার। বাড়ি থেকে বেরনোর আগে দরজায় তালা দেওয়া হয়েছে কি না, সেটা দেখতে ফিরে আসছে সতেরো বার, অফিসে দেরি করে ফেলছে। বারবার বসছে গৃহদেবতার কাছে, নিজের মনের কোণে বসে থাকা অশুচি চিন্তাকে দূর করতে না পারার অপরাধবোধ থেকে করে চলছে ক্ষমাপ্রার্থনা। সবাই বলে, পাগল কোথাকার, সেয়ানা পাগল। ক'জন বোঝে অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার (OCD) রোগীর যন্ত্রণা? লিখছেন **ডা. সুমিত দাস।**

আমি তখন সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছি। পূর্ণ উদ্যমে দূর দূর মফস্বল শহরেও চেম্বার খুলে ফেলেছি। এরকমই এক চেম্বারে এক রোগী এলেন। মহিলা, বয়স ৩০-৩৫ বছর হবে। খুব উদ্বিগ্ন। অন্তত ১০ বছরের সমস্যা। ওঁর ধোয়াধুয়ির বাতিক। আগে চান করতেই বেশি সময় যেত। তারপর বাড়ির সব জিনিস নোংরা লাগতে শুরু করল এবং ধোয়াধুয়িও বাড়ল। পাশে বসা বিরক্ত স্বামী বললেন বাইরে থেকে এলে তাঁকে সাবান মেখে স্নান করতে হচ্ছে। এমনকী চালে কী পড়েছিল বলে একদিন সাবান দিয়ে চালও ধুয়েছিল। এতটা সব সময় না হলেও ধোয়াধুয়ির বাতিকগ্রস্ত মানুষ অনেক দেখা যায়। আমাদের চালু ভাষায় যাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত বলা হয়। এই রোগের পোশাকি নাম হচ্ছে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। তবে কারও কারও এক চিন্তা বারবার আসা, কেউ তালা বন্ধ করে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে টেনে টেনে চেক করে যায়। এই ধরনের নানা রূপ নিয়েও এই রোগ আসে।

সব থেকে বেশি যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে নোংরা বা রোগ জীবাণুর ভয়।

সারা পৃথিবীতে শতকরা ২-৩ ভাগ মানুষের এই রোগ হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা সমান ভাবে আক্রান্ত হন। মোটামুটি গড়ে ২০ বছর বয়সের আশপাশে এই রোগের আক্রমণ হয়। তবে বাচ্চাদেরও এবং কমবয়সী ছেলেমেয়েদেরও এই 'অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার' হয়।

রোগ চেনার উপায় :

অবসেসন আর কমপালসনের মধ্যে পার্থক্য আছে। অবসেসন বলতে বোঝায়, একটা বারবার আসা যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা, কোনও প্রতিচ্ছবি, যা তীব্র কোনও উদ্দীপনা। কিন্তু কমপালশন বলতে বোঝায় বারবার করা একটা আচরণ, যেমন ধোয়াধুয়ি। এবং এই বিশেষ কাজটা সে করতে বাধ্য হয়, তা না হলে তার মনে উদ্বেগ বাড়ে। শতকরা ৭৫ ভাল রোগীর অবসেসন এবং কমপালশান দু'টিই থাকে। বাকিদের শুধু অবসেসন বা শুধু কমপালশান থাকে।

সব থেকে বেশি যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে নোংরা বা রোগ জীবাণুর ভয়। তার ফলে আক্রান্ত মানুষটা নিজের হাতপা ধুচ্ছেন, সঙ্গে বাড়ির যে কোনও জিনিস----তালা চাবি, সুইচ, ফোন, খবরের কাগজ ইত্যাদি ধুয়ে ফেলছেন। তার পরে যেটা খুব দেখা যায়, সেটা হচ্ছে আবসেসিভ ডাউট। আক্রান্ত মানুষটার মনে হল সে গ্যাস ওভেনের নবটা বন্ধ করেনি বা বাড়ির দরজার তালা দেয়নি। তাই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এসে এগুলো চেক করে যায়। এবং চেক করা স্বভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। কারোর কারোর নিজের ওপর সন্দেহ হয়— যেমন সে হঠাৎ কাউকে আঘাত করে ফেলতে পারে বা খুন করে ফেলতে পারে এই ধরনের চিন্তা হয়। কারোর ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ধর্মীয় ভাব জেগে ওঠে। আবার কারোর মনে হয় কোনও ঠাকুরকে লাথি মেরে ফেলছে বা অন্য কোনও ভাবে অসম্মান করে ফেলছে। কারোর আবার মন্দির / মসজিদে ঢুকে খারাপ চিন্তা, অনেক ক্ষেত্রে যৌনতামূলক চিন্তা, চলে আসে। এছাড়া অন্য সময়ও যৌনতামূলক চিন্তা যেটা রোগীর পক্ষে কষ্টকর, বার বার চলে আসে। কারও কারও আবার সব কিছু একে যাবে নিখুঁত করে রাখার বাতিক হয়। বিছানা, জামা, কাপড়, বইপত্তর—একে বারে যেখানকার জিনিস সেখানে রাখতে চায়। এই নিখুঁত করার চেষ্টায় কাজ শেষ করতে প্রচুর সময় নিয়ে ফেলে।

সামগ্রিক ভাবে এই রোগ খুব যন্ত্রণাদায়ক। এবং অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডারের সঙ্গে সোস্যাল ফোবিয়া (সামাজিক আতঙ্ক রোগ) বা ডিপ্রেসান (অবসাদ রোগ) এবং অন্যান্য মানসিক রোগ থাকতে পারে।

রোগের কারণ :

(১) জৈবনিক কারণ : সেরটোনিন নামে রাসায়নিক মস্তিষ্কে সঠিক মাত্রায় না থাকার জন্য এই রোগ হয় বলে ধরা হয়। সেই জন্য যে সব ওষুধ সেরটোনিনের মাত্রা বা কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় সেগুলো অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডারে ভাল কাজ করে। এছাড়া আরও কিছু ওষুধ, যেমন নরঅ্যাড্রিনালিন নামক নিউরোট্রান্স মিটারও এই রোগে কিছু ভূমিকা নেয়। বাবামায়ের এই রোগ থাকলে সন্তানের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই রোগে আক্রান্তদের মস্তিষ্কের কিছু অংশ যেমন কডেট লোব ছোট হয়। এছাড়া, আরও কিছু অংশে কিছু অস্বাভাবিকতা থাকে।

২। আচরণগত কারণ : এই তত্ত্ব অনুযায়ী সাধারণ ভাবে কোনও একটি বস্তু বা চিন্তা, যেটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ দেখে, তার সঙ্গে কোনও ভাবে একটা আতঙ্কগ্রস্ত পরিস্থিতি জড়িয়ে গেলে অবসেশন শুরু হয়। অর্থাৎ পরবর্তীকালে ওই স্বাভাবিক চিন্তাটাই তার কাছে তীব্র উদ্বেগ তৈরি করে। আর এই উদ্বেগ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়ে সে বিভিন্ন কাজ বার করে— যেমন হাত পা ধোয়া, এক থেকে একশো গোনা ইত্যাদি। এতে করে তার উদ্বেগ কমে। এবং এভাবেই সৃষ্টি হয় কমপালশন।

৩। মনোবৈজ্ঞানিক কারণ : ফ্রয়েড মনে করতেন মানসিক চাপে যখন কোনও মানুষ যখন মানসিক দিক দিয়ে শৈশব অবস্থায় কোনও দশায়, তাঁর তত্ত্বে 'অ্যানাল ফেজে', ফিরে যায় তখন এই রোগ হয়।

এখনকার চিন্তাভাবনাগুলো অনেক বদলেছে। ধরা হয়, আক্রান্ত মানুষটা অবচেতন ভাবেই এই অবসেশন দিয়ে কিছু চাহিদা পূরণ করে। যেমন, কোনও কর্মরতা মা যখন কাজে বেরিয়ে যান, তার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সন্তানের মধ্যে এই ধরনের উপসর্গ তৈরি হতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন রকম মানসিক চাপের জন্য অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার হতে পারে। যেমন গর্ভধারণ, সন্তান জন্ম দেওয়া বা কোনও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সামনে হওয়ার এই রোগ হতে পারে।

রোগের ভবিষ্যৎ :

অর্ধেকের বেশি রোগীর রোগটা হঠাৎ করে শুরু হয়। শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে মানসিক চাপ থেকে হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। বাকিদের নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগী ডাক্তারের কাছে আসতে দেরি করে, অনেক ক্ষেত্রে ৫-১০ বছরও দেরি করে। চিকিৎসার পরে শতকরা ২০-৩০ ভাগ রোগীর ভাল উন্নতি হয়। ৪০-৫০ ভাগ রোগীর মোটামুটি উন্নতি হয়। আর বাকি ২০-৪০ ভাগ রোগী অসুস্থই থাকে অথবা ক্রমশ আরও খারাপ হয়। এক- তৃতীয়াংশ রোগীর অবসাদ রোগ থাকে। তাই এই ধরনের রোগীর আত্মহত্যা করার একটা প্রবল সম্ভাবনা থাকে। যে সমস্ত রোগী তার রোগের উপসর্গকে প্রতিরোধ না করে আরও বেশি করে সময় দেয়, তাদের ভবিষ্যত খারাপ হয়। এছাড়া ছোটবেলায় রোগের সূত্রপাত, অদ্ভুত ধরনের কমপালশন এবং রোগের তীব্রতার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া—এসব থাকলে রোগীদের ভবিষ্যত খারাপ হয়। যারা সামাজিক এবং কর্মক্ষেত্রে ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত, একটা নির্দিষ্ট কারণে হঠাৎ রোগ শুরু হয়—তাদের ভবিষ্যৎ ভাল হয়।

> চিকিৎসার পরে শতকরা ২০-৩০ ভাগ রোগীর ভাল উন্নতি হয়। ৪০-৫০ ভাগ রোগীর মোটামুটি উন্নতি হয়। আর বাকি ২০-৪০ ভাগ রোগী অসুস্থই থাকে অথবা ক্রমশ আরও খারাপ হয়।

চিকিৎসা : চিকিৎসা দু'ভাবে হয়। ওষুধ দিয়ে এবং মনোচিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি। ওষুধের মধ্যে ফ্লুঅক্সেটিন, সাবট্রালিন, ক্লোমিপ্রামিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়।

দেখা গেছে বিহেভিওর থেরাপি বা আচরণ পরিবর্তনকারী চিকিৎসা খুবই ফলপ্রসূ হয়। বিশেষ পদ্ধতিতে যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা এবং কাজকর্মকে ধীরে ধীরে বন্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিগুলোর পোশাকি নাম রেসপন্স প্রিভেনশন, থট স্টপিং, ফ্লাডিং, ডিসেনসিটাইজেশন ইত্যাদি। দেখা গেছে, বিহেভিওর থেরাপি অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডারে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা—এমনকী, কিছু ক্ষেত্রে ওষুধের থেকেও এটা অধিক কার্যকরী হয়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার বা OCD একটা কঠিন মানসিক রোগ। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের প্রথম দশটা কঠিন রোগের মধ্যে এই রোগ স্থান করে নিয়েছে। তাই উপসর্গ দেখামাত্রই এই রোগের চিকিৎসা শুরু করা উচিত।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুমিত দাস, এমবিবিএস, ডিপিএস, মনোচিকিৎসক, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষের জন্য এক ক্লিনিকে আংশিক সময়ের মনোচিকিৎসক।

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

যন্ত্রণা নিয়ে ব্যক্তিগত

এষা মিত্র

সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায়, আপনাকে আমি চিনি না। তবে শুনেছি, খুব যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হয়েছিল আপনার। এক্টোপিক প্রেগন্যান্সিতে।

অন্য একটা মেয়েকে চিনতাম। পরীক্ষার জন্য রক্ত দিতে হলে চোখ দিয়ে জল বেরোত। ঠাট্টা করে বলতাম, 'ওরে আমার নেকু রে'। টাইফয়েড হয়েছিল। হঠাৎ এক সন্ধ্যাবেলায় মোবাইলে টেক্সট এল, 'আমি আর পারছি না'। ফোন করলাম। কথা বলার অবস্থা ছিল না। জ্বরের ঘোরে, শরীরে অস্থিরতা। পাশেও কেউ ছিল না। মাঝে মধ্যেই পিঠের ব্যথায় ভুগত। 'পিঠে হাত বুলিয়ে দাও বা মাথায় হাত বুলিয়ে দাও'। এটাই বলত। ন্যাকা। হয়তো অনেকেই বলবেন। একদিন ভোররাত থেকে টানা ১০ ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা (ভিতরে অবিরাম রক্তক্ষরণ) ভোগ করে সে যখন চলে গেল, এটুকুই ভেবেছেন আত্মীয়-পরিজনরা, 'ওই মেয়ে এত যন্ত্রণা সহ্য করল কী করে'? যন্ত্রণার দাপটে সহ্য ক্ষমতা চলে গিয়েছিল কি? শুনেছি, একবার শুধু বলেছিল, ''আমি আর পারছি না''।

সহ্য সে করেছিল। মানসিক যন্ত্রণা নিপুণভাবে লুকিয়ে রেখে হাসির ক্ষমতা রাখত সে। অনেকেই রাখেন। আমাদের পরিবারে মায়েরা, মাসিরা, দিদিরা, বোনেরা, মেয়েরা, আমরা। যে যে ভাবে পারি। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শারীরিক যন্ত্রণা বেশি সহ্য করেন কি না, খুঁজতে গিয়ে দেখছি, (ইন্টারনেট-অভিধানে) বাথ বিশ্ববিদ্যালয়, লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের গুচ্ছের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সাধারণভাবে পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে শারীরিক যন্ত্রণা অনেক বেশি সহ্য করেন। মেয়েরা ব্যথা, যন্ত্রণা পেলে অনেক বেশি প্রকাশ করেন। বিলেতের একটা নামজাদা ট্যাবলয়েডে তো এই ধরনের সমীক্ষা প্রকাশ করে শিরোনামই দিয়েছিল, 'ফরগেট অ্যাবাউট লেবার, মেন ক্যান এনডিওর মোর পেন দ্যান উইমেন।' ওই সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, পুরুষেরা 'ইগো'য় লাগবে বলে যন্ত্রণাটা প্রকাশ করেন না বা সামাজিকভাবে যে পুরুষত্ব তাঁদের দেখাতে হয়, তাতে কান্না চলে না। 'বয়েজ ডোন্ট ক্রাই'। ফলে বেশ কয়েকশো পুরুষ এবং মহিলার পরীক্ষা করিয়ে দেখা গিয়েছিল, ছেলেদের শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা বেশি।

ট্যাবলয়েডের ওই শিরোনামের প্রতিবাদও হয়েছিল কম নয়। অনেকেই পাল্টা লিখতে শুরু করেন, ছেলেরা তো সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেননি, এবং জন্ম দেওয়ার কষ্টও তাঁরা বুঝবেন না। ফলে এই বিতর্ক চলবেই।

আমি সমাজতাত্ত্বিক নই, চিকিৎসকও নই। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বাড়িতে এবং চারপাশে, বিশেষত মেয়েদের এই যন্ত্রণা সহ্য করার বিষয়টা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। মায়েদের দিয়ে শুরু হয়। জ্বর,

পেটে ব্যথা, কোথাও কেটে গেল— 'কিছু হয়নি। ডাক্তার ডাক্তার করিস না, ও ঠিক হয়ে যাবে' বা 'তোরা আর কত করবি'। সেপটিসিমিয়ায় আক্রান্ত আমার মাকে যখন অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যাই, তখন তিনি বলেছিলেন, ''তোরই ভোগ''। কারণ, দিনটা ছিল শনিবার, আমার ডে-অফ। খুব ছোট বেলায় পিতৃহারা আমার মা ওই ছোটবেলা থেকেই শিখে গিয়েছিলেন নিজের চাহিদা, প্রয়োজন, কষ্টকে লুকিয়ে রাখতে। পরে আসে যৌথ পরিবারের দায়িত্ব। ফলে নিজেকে লুকিয়ে রাখা আর আত্মত্যাগ।

> ছেলেরা তো সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেননি, এবং জন্ম দেওয়ার কষ্টও তাঁরা বুঝবেন না

আমার চেনা মেয়েটা বাথরুমের সামনে বমি করে ফেলে স্বামীকে বলেছিল, ''তোমাকে বড্ড ভোগাচ্ছি।'' এই দ্বিধা কেন? ওর এবং আরও অনেকের, অনেকের? কারণ, প্রধানত, তাঁরা বলার সুযোগই পান না। চারপাশে লোক থাকলেও শোনার সময় নেই, শুনলেও ডাক্তার দেখানোর সময় নেই। এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ডাক্তার দেখানোরই পয়সা নেই। অন্যের ভার নিতে নিতে নিজেদের কথা ভাবতেই ভুলে যান। মেয়েদেরও মনে হতে শুরু করে, 'সামান্য উপসর্গ। এ আর কী হবে। নিজের থেকেই সেরে যাবে।' বা 'বাড়ি অফিস, ডাক্তার দেখানোর সময় কই'? অথচ উপসর্গগুলো হয়তো ভয়ঙ্কর কোনও রোগের। এখনও এই উত্তর-আধুনিক যুগে কথাগুলো বলতে হচ্ছে এবং হবেও বোধহয় আগামী অনেক যুগ ধরে। কারণ, মেয়েদের ক্ষেত্রে 'শরীর নিয়ে বাতিক', ও তো 'চিররুগণ', 'পুতুপুতু ভাব', 'ন্যাকা' ইত্যাদি তকমাগুলো আবহমান কাল ধরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমার খুব ছোট্ট পৃথিবীতে 'কিছু হলেই এলিয়ে পড়া' মেয়ে দেখলাম না একটাও। আমার চেনা মেয়েটার যন্ত্রণা এবং পরবর্তী চিকিৎসার নামে অচিকিৎসার কথা শুনে এক ডাক্তারবাবুই বলেছিলেন, ''আপনার হয়তো শুনতে খারাপ লাগবে। কিন্তু সুন্দরী মেয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে দেখে ডাক্তার হয়তো ভেবেছিলেন, বাবা! সুন্দরী, অল্পবয়সী মেয়েদের এই এক ন্যাকামো। কিছুই সহ্য করতে পারে না।''

মেয়েদের প্রসব যন্ত্রণার সময় চারপাশের মহিলারা বলতেন, সহ্য করো, সহ্য করো, মেয়েমানুষকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। কারণ, তাঁরা সহ্য করেছেন। আমার একবার একটা অস্ত্রোপ্রচারের পর পেথিডিন কাজ করেনি। ফলে কাটা পাঁঠার মতো অবস্থা। আমার মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, ''সহ্য কর, সহ্য কর।''

এই সহ্য করতে করতে, মানিয়ে নিতে নিতে, চুপ করে থাকতে থাকতে এবং অসুখ এবং অ-সুখ গোপন করতে করতে মেয়েরা যে ফুরিয়েই যান। আর সহ্য করবেই বা কেন? আরে, যন্ত্রণা হলে বলতে পারব না যে যন্ত্রণা হচ্ছে? অবশ্যই পারবেন এবং বলবেন। জ্বর হলে বলবেন, চোখ করকর করলে বলবেন, পায়ে চুলকুনি হলে বলবেন, কান কটকট করলে বলবেন। এবং সেটা শুনতে হবে। চারপাশের লোকেরা শুনবে। শোনার কানটা তৈরি করতে হবে এবং করাতে হবে। না শুনলে, না বললে এক সময় দেখব, শরীরে গভীর এবং অচিকিৎস্য সব অসুখ রোগ নিয়ে আমাদের মা, বোন, কাকিমা, জেঠিমা, বন্ধু, সন্তান সবাই কনেসৃনে বেঁচে রয়েছে। ভুল বললাম, বেশিদিন আর তারা নেই।

অতএব, স্পষ্ট করে বলি, মুখটা খুলুন। এখনকার ভাষায়, হোক কলরব। না বললে কেউ শুনবে না। শোনাতে হবে, বলতে হবে। কারণ, না বললে ক্ষতিটা আপনার। আত্মত্যাগের ইন্ডাস্ট্রি খুলবেন না। জীবনটা আপনার। তাকে নষ্ট করে লাভ নেই।

সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায়, আপনাকে বোধহয় আমি চিনি!

লেখক পরিচিতি : এষা মিত্র, প্রাবন্ধিক।

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭ দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের মূত্রনালীতে সংক্রমণ

(ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ইউটিআই)

মেয়েদের মূত্রনালীতে সংক্রমণ বা ইউটিআই ছেলেদের তুলনায় বেশি হয়। কারণটা খানিকটা শারীরিক, আর অনেকটাই সামাজিক। এটা কিন্তু অনেকটাই আটকানো যায়— লিখছেন **ডা. প্রতাপশঙ্কর দত্ত।**

গত পাঁচ দশক ধরে চিকিৎসা বিশেষত অস্ত্রচিকিৎসার সঙ্গে জড়িত আছি। জেনারেল সার্জারি তো বটেই মূত্রাশয় সংক্রান্ত নানাবিধ রোগ কখনও ওষুধ, প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ করে রোগগ্রস্ত মানুষকে নিরাময়ের চেষ্টা করেছি। পাঁচ দশক আগে বিদেশে, তারপর এ দেশে মুত্রনালীর সংক্রমণ খুবই কম পেয়েছি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সমাজে জীবনযাত্রা বদলের সঙ্গে সঙ্গে মূত্রনালীর সংক্রমণ বহুগুণ বাড়তে দেখেছি, গত তিন দশকের বেশি সময়ে, বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে। কারণ, মেয়েরা আগের তুলনায় অনেক বেশি পড়াশোনা করতে বেরোচ্ছেন, তারপর কর্মস্থলে। আর কে না জানেন, আমাদের দেশে শৌচালয়ের কত অভাব এবং থাকলেও তা কতটা অস্বাস্থ্যকর।

> পথে এবং কার্যালয়ে শৌচালয়ের অভাব এবং পরিচ্ছন্ন শৌচালয়ের অভাবে মেয়েরা বহুক্ষণ মূত্রত্যাগ করেন না

চিকিৎসক হিসাবে এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে মূত্রাশয় সংক্রান্ত রোগে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি ভোগেন, বিশেষত মূত্রনালীর সংক্রমণের ক্ষেত্রে। প্রথমে বলে রাখি, মূত্র ত্যাগের মাধ্যমে শরীর থেকে বর্জ্য এবং দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছাঁকনির মতো কাজ করে।

কেন মেয়েরা বেশি ভোগেন?

আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক ব্যবস্থা এজন্য বর্তমান সমাজে পুরুষদের সঙ্গে মহিলারাও অনেকক্ষণ থাকেন। পথে এবং কার্যালয়ে শৌচ শৌচালয়ের অভাবে মেয়েরা বহুক্ষণ মূত্রত্যাগ তা ধরে রাখতে বাধ্য হন। কোনও জলাধারে থাকলে বীজাণু জন্মানো সহজ, সেই নিয়মে মা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয়ত, মহিলাদের মূত্রনালী (৫ সেমি) সেমি) ছোট হওয়ায় বহিরাগত সংক্রমণ স ক্ষেত্রে মূত্রত্যাগের পথ পুরুষের তুলনায় কাছাকাছি। ফলে অন্ত্রে (intestine) থাকা ছড়াতে পারে।

অন্যান্য কারণগুলো অবশ্য পুরুষ ও মহি সৃষ্টি করে না। যেমন সমগ্র মূত্র নির্গমণ প ব্লাডার, ইউরেথ্রা) কোনও অসুখ। যেমন কিড মূত্রাশয়ে সংক্রমণ বা পাথর বা টিউমার— যেগুলো ওপর থেকে সংক্রমণ বয়ে নিয়ে মূত্রাশয়ে আসে।

বাইরের থেকে মহিলাদের মূত্রাশয়ে আক্রমণ সাধারণত মূত্রনালীর দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় সহজ হয়। নিজস্ব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতারও খুব প্রয়োজন হয়। মহিলারা শৌচালয়ের অভাবে বহুক্ষণ জল না খেয়ে থাকেন। তাও সংক্রমণে সহায়তা করে।

অধিক সন্তানের জন্ম দিলে মহিলাদের ক্ষেত্রে আরও একটা বড় রোগ হয়, যা সংক্রমণের বড় কারণ হতে পারে। তা হল মূত্রাশয়ের জরায়ুর সামনে নেমে আসা এবং থলির মতো হয়ে থাকা। সেটা মূত্র নিষ্কাশনে বাধার সৃষ্টি করে (cystocele)।

সংক্রমণ কী করে বুঝবেন

১। বারবার প্রস্রাব হবে।
২। প্রস্রাবের সময় জ্বালা করবে।
৩। রক্ত প্রস্রাব হতে পারে।
৪। জ্বর হবে, সেই সঙ্গে কাঁপুনি হতে পারে।

কী করতে হবে

১। প্রচুর জল খেতে হবে।

২। প্রস্রাব দ্রুত পরীক্ষা করতে দিতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে।

৩। নিজস্ব পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে।

৪। বারবার সংক্রমণ হলে চিকিৎসকের পরামর্শমতো অনুসন্ধান পদ্ধতি মানতে হবে, যাতে কিডনি ফেলিওরের মতো গুরুতর সমস্যা তৈরি না হয়।

কী কী জীবাণু?

সাধারণত যে সব জীবাণু এ ধরনের সংক্রণ ঘটায়, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ই. কোলি (Escherichia coli, যাকে সহজ ভাষায় বি. কোলি সংক্রমণ বলা হয়)। তাছাড়া Klebsella group, ও নানা যৌন রোগ (veneral disease) সংক্রামক হিসাবে ভোগাতে পারে। সবচেয়ে বেশি ভোগাতে পারে Pseudomonas Pyosinus সংক্রমণ।

অনেকেরই মূত্রনালীতে বারবার সংক্রমণ হয় কেন?

আগেই বলেছি, মহিলাদের মূত্রত্যাগের নালীটা ছোট বলে বারবার সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আর ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতাও অনেকটা দায়ী।

সাধারণত সংক্রমণ এড়াতে মেয়েদের কী কী করা উচিত?

অবশ্যই জল বেশি খাওয়া উচিত। মূত্র অনেকক্ষণ চেপে থাকা উচিত নয়। মূত্রত্যাগের পর ওই জায়গা জল দিয়ে খুব ভাল করে পরিষ্কার করতেই হবে। অনেক অফিসেই পেপার-রোল থাকে। কিন্তু অফিসে বা বাইরে পাবলিক টয়লেটে রাখা টয়লেট-রোল কতটা পরিষ্কার, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ফলে জলের ব্যবহারই নিরাপদ। কোনও জায়গায় জলের ব্যবস্থা না থাকলে পরে সুযোগ পাওয়া মাত্রই জল দিয়ে মূত্রত্যাগের জায়গাটা ধুয়ে ফেলতেই হবে। অন্তর্বাস খুবই পরিষ্কার রাখতে হবে। সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মূত্র নিষ্ক্রমণের পথে কোনও বাধা থাকতে পারে। যেমন পাথর বা বারবার সংক্রমণের জেরে নিষ্ক্রমণের পথ ছোট হয়ে যাওয়া। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে অতি অবশ্যই পরামর্শ করুন। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তানের চাপ মূত্রাশয়ে পড়ে, মূত্র ত্যাগের রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

লেখক পরিচিতি : ডা. প্রতাপশঙ্কর দত্ত, এফআরসিএস, ইউরোলজিস্ট এবং সার্জন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

If undelivered please return to

Safe International

P-95, Kalindi Housing Estate,
Kolkata - 700089, WB, India,
Ph & Fax - (033) 25223051, 9831908000
Email: safeinternational@gmail.com

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

ডিসমেনোরিয়া বা মাসিকের সময় ব্যথা

এক পা নড়তেও প্রাণ বেরিয়ে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে থাকা। স্কুল-কলেজ বা অফিসে যাওয়ার অবস্থাই থাকে না। মাসের কয়েকটা দিন, অন্তত দু'টো দিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করা। অনেকে ভাবেন এমন হওয়াই স্বাভাবিক, ডাক্তাররাও অনেকেই তেমন ভাবেন। তাই এত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা ডাক্তররা অনেক সময় বলেন, ব্যথা সহ্য করতে। কিন্তু কেন ব্যথা সহ্য করবেন, যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যথা সহজেই কমানো যায়? লন্ডনের Women's Health সংস্থার প্রচার-পত্র 'Painful Periods' তাই বলছে— লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ।**

চার সপ্তাহ ধরে শরীরে স্ত্রী হরমোনগুলোর প্রভাবে জরায়ুর দেওয়ালের ভেতরের আবরণী আস্তে আস্তে পুরু হয়ে একটা গদি তৈরি করে যাতে সেখানে একটা নিষিক্ত ডিম্বাণু আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু ডিম্বাণুর সঙ্গে যদি শুক্রাণুর মিলন না হয় অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চার যদি না হয় তা হলে এ গদি কাজে লাগে না। তখন জরায়ুর ভেতরের পর্দাটা ভেঙে গিয়ে যোনিপথে বেরতে থাকে— যাকে আমরা বলি মাসিক রজোস্রাব। কেউ আবার মাসিক রজোস্রাবকে বলছেন Crying of the Womb— গর্ভ সঞ্চার না হওয়ার দুঃখে জরায়ুর হাহাকার।

রজোস্রাবের সঙ্গে কেবল ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়া পর্দাটাই বেরোয় এমন নয়— জরায়ুর ভেতরের আবরণী ভেঙে যাওয়ার ফলে যে কাঁচা ঘা (raw surface) হয় সেখান থেকে রক্তও চুঁইয়ে আসতে থাকে। শরীরের অন্য কোথাও থেকে রক্তপাতের সঙ্গে মাসিক রজোস্রাবের ফারাক হল—অন্য জায়গার ক্ষরিত রক্ত জমাট বেঁধে রক্তের দলা তৈরি করে, মাসিকের রক্ত জমাট বাঁধে না।

রজোস্রাবের কিছু আগে থেকে ও রজোস্রাবের সময় যে উপসর্গগুলো হয়— সেগুলোকে বলে ডিসমেনোরিয়া (Dysmenorrhea), বাংলায় বলা যায় মাসিকের ব্যথা।

রজোস্রাবের সময়ের ব্যথা দু'ধরনের :

স্প্যাসমোডিক ডিমেনোরিয়া (spasmodic dysmenorrhoea) আর কনজেস্টিভ ডিসমেনোরিয়া (congestive dysmenorrhoea)। এক এক জনের এক এক রকম ব্যথা হতে পারে। কারও কারও আবার দু' ধরনের ব্যথাই মিলে মিশে হয়।

১. স্প্যাসমোডিক ডিসমেনোরিয়া : স্প্যাজম মানে খিঁচুনি। অন্য যে কোনও মাংসপেশির মতো জরায়ুর মাংসপেশিরও সঙ্কোচন-প্রসারণ হয়। সঙ্কোচন-প্রসারণ বেশি মাত্রায় হলে কামড়ানো ব্যথা অনুভূত হতে পারে। ব্যথা সাধারণত তলপেটে ও যৌনাঙ্গে হয়, তবে জঙ্ঘার ভেতর দিকে ও কোমরেও হতে পারে। প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ও ইস্ট্রোজেন এই সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটায়, মাসিক রজোস্রাবের সময় শরীরে এরা থাকে খুব বেশি মাত্রায়। জরায়ু মাংসপেশির সঙ্কোচন-প্রসারণের জন্য ব্যথা হলেও আসলে এই সঙ্কোচন-প্রসারণ কাজের ভেঙে যাওয়া আবরণীর টুকরো আর রক্ত যোনিপথে বার করতে সাহায্য করে।

২. কনজেস্টিভ ডিসমেনোরিয়া : কনজেশন মানে রস জমা। এ ক্ষেত্রে মহিলারা শরীরে ফোলাভাব অনুভব করেন। স্তন, পেট, যৌনাঙ্গ, কব্জি ও গোড়ালি মাসের অন্য সময়ের তুলনায় ফুলে থাকে। কষ্টগুলো শুরু হয় রজোস্রাব শুরু হওয়ার কিছু আগে। তলপেটে লাগাতার একঘেয়ে একটা ব্যথা, মাথাব্যথা, কোমরে ব্যথা, বমিভাব, পাতলা বা কষা পায়খানা, ক্লান্তি— এ সব হতে দেখা যায়। ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন— এই দুই স্ত্রী হরমোনের প্রভাবে তলপেটের কোষকলায় রস জমে চাপ বাড়ার জন্য ব্যথা হয়। ধারণা করা হয়, দুই হরমোনের পরিমাণের ভারসাম্যের যদি অভাব হয়, প্রজেস্টেরনের তুলনায় ইস্ট্রোজেন বেশি মাত্রায় থাকলে রস জমে ব্যথা হয়।

চিন্তার কারণ আছে কি?

অনেকেরই মেনোপজ অর্থাৎ বরাবরের জন্য মাসিক বন্ধ হওয়া অবধি মাসিকের ব্যথা হয়। তাই সাধারণ ভাবে চিন্তার কিছু নেই।

কিন্তু যদি দেখেন —

- আগে ব্যথা হতো না, এখন হচ্ছে।
- রক্তস্রাব বেশি হচ্ছে।
- রজোস্রাব অনিয়মিত হচ্ছে।

তা হলে ডাক্তার দেখিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করানো দরকার। হয়তো ব্যথার নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে, অনেকগুলো কারণের চিকিৎসাও আছে।

যে সব কারণের নির্দিষ্ট চিকিৎসা আছে

- পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ (pelvic inflammatory disease) বা তলপেটে জীবাণু সংক্রমণ— জরায়ু বা ডিম্ববাহী নালির সংক্রমণে পুরো মাসটাই ব্যথা হতে পারে অথবা হতে পারে কেবল রজোস্রাবের সময়। সাধারণত জীবাণু সংক্রমণ যৌনসম্পর্ক থেকে হয়। অনেক সময় যোনিপথে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব দেখা যায়। ক্ল্যামাইডিয়ার মতো জীবাণু সংক্রমণে আবার এমন উপসর্গ থাকে না। যৌন সম্পর্ক শুরু করার পর

রজোস্রাবের সময় ব্যথা হলে তাড়াতাড়ি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করা উচিত যাতে সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে না পড়ে।

- এন্ডোমেট্রিয়োসিস (endometriosis)- জরায়ুর ভেতরের আবরণীর নাম এন্ডোমেট্রিয়াম। এ রোগে এন্ডোমেট্রিয়ামের কিছু অংশ তলপেটে বা অন্য কোথাও বাড়তে থাকে। মাসিক রজোস্রাবের সময় সেই অংশগুলোতেও একই রকম পরিবর্তন হয়ে খুব ব্যথা হয়।
- ওভারিয়ান সিস্ট (ovarian cyst)- স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র আগের সংখ্যায় (অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৪) এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন ডা. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়। শুধু মনে রাখুন ডিম্বাশয়ের ভেতরে ডিমের থলিগুলোতে রস ভরে গিয়ে চাপ বাড়ার জন্য ব্যথা হতে পারে মাসের যে কোনও সময়েই, তবে রজোস্রাবের সময় ব্যথা বেশি হয়।
- ফাইব্রয়েড (fibroid)- এই টিউমার ম্যালিগন্যান্ট নয়, মানে ক্যানসার জাতীয় নয়। ফাইব্রয়েড টিউমার জরায়ুর দেওয়ালের বাইরে, দেওয়ালের মাংসপেশিতে বা জরায়ুর ভেতরে হতে পারে। জরায়ুর ভেতরে এই টিউমার হলে বেশি রক্তস্রাব এবং মাসিকের সময় ব্যথা হতে পারে।
- এন্ডোমেট্রাইটিস (endometritis)- এন্ডোমেট্রিয়োসিস নয়, '- আইটিস' মানে জরায়ুর ভেতরের আবরণীর প্রদাহ। জীবাণু সংক্রমণের জন্য হতে পারে, হতে পারে গর্ভনিরোধের জন্য কপার টি-জাতীয় কোনও ইন্ট্রাইউটেরাইন ডিভাইস ব্যবহারের জন্যও। কারণ খুঁজে চিকিৎসা করলে ব্যথা কমবে।

ব্যথা কমানোর জন্য নিজে কী করা যায়?

- স্নান, বিশ্রাম ও শরীরকে ঢিলে দেওয়া (relaxation)- এগুলো সব সময় করা হয় না। কিন্তু তা করলে মাসিকের ব্যথার উপসর্গ অনেকটাই কমে। বিভিন্ন অবস্থানে থেকে মাংসপেশিকে ঢিলে করে দিলে কষ্ট কমে (১) দু' হাঁটু ও কনুই সোজা রেখে দু' হাতের ওপর শরীর তুলে রাখা, (২) চিৎ হয়ে শুয়ে একটা করে পা হাঁটু মুড়ে পেটের সঙ্গে লাগিয়ে দু' হাত দিয়ে ধরে রাখা, (৩) হাঁটুর ওপর ও কনুইয়ের ওপর থেকে পিছনটা তুলে রাখা, (৪) চিৎ হয়ে শুয়ে দু' পা সোজা করে তোলা।
- গরম সেঁক ও মালিশ : গরম সেঁক বা গরম জলের বোতল লাগালে রক্ত-চলাচল বেড়ে মাংসপেশির খিঁচ ধরা ভাবটা কমে। মালিশেও তেমনই হয়। এক দিকের কোমরের হাড় থেকে 'V'-এর মতো নেমে আসুন যোনি এলাকার চুলের ওপর, আবার উঠে যান অন্য দিকের কোমরের হাড়ে, আঙুলের ডগা দিয়ে চুলের রেখার ওপর বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে মালিশ করুন।
- ব্যায়াম : সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা ও জোরে হাঁটা খুব উপকার দেয়। এছাড়াও কতগুলো ব্যায়াম কার্যকর।

মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁটু দু'টোর নিচে একটা বালিশ রাখুন। প্রথমে পা, তারপর পায়ের ডিম, জঙ্ঘা, পিছন ... থেকে নিয়ে গলা, মুখের মাংসপেশি অবধি - একেক জায়গার মাংসপেশি ৫-১০ সেকেন্ড টাইট করে ধরুন, তারপর শ্বাস ছাড়ুন। সব মিলিয়ে ১০ মিনিটের মতো সময় লাগবে।

আরেকটা কাজের ব্যায়াম—ডাঙায় সাঁতার কাটা। একটা মজবুত টেবিলে বালিশ রেখে তার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত ও পা টেবিলের ধারে ঝুলতে থাকবে। ব্যাঙের চলার মতো ব্রেস্ট স্ট্রোক দিন দিনে মিনিট ছয়েক।

- রজঃস্রাবের রকমারি ভাল খাবার-দাবার খেতে পারলে ভাল। এই সময়ে তরল, নুন, চিনি, চা ও কফি (অর্থাৎ যাতে কেফিন আছে) খাওয়া কমিয়ে অনেকে আরাম পান।

ডাক্তারি চিকিৎসা :

আগে বলা যাক, ঘরোয়া চিকিৎসায় ফল না পেলে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। অনভিজ্ঞ ডাক্তার অবশ্য অনেক সময় কেন ডিসমেনোরিয়া হচ্ছে তা, বা উপসর্গ কমানোর অন্য উপায়গুলো না জানায় কেবল ব্যথা কমানোর ওষুধ দেন।

- বেদনানাশক ওষুধ : অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন, মেফেনেমিক অ্যাসিড ইত্যাদি ওষুধ জরায়ুর মাংসপেশির সঙ্কোচন-প্রসারণ কমিয়ে ব্যথা কমায়। তবে পেপটিক আলসার থাকলে এ সব ওষুধ খাবেন না। যখনই খান না কেন, খান খাবারের সঙ্গে। প্যারাসিটামলও ডিসমেনোরিয়ার ব্যথা ভাল কমায়।
- হরমোন দিয়ে চিকিৎসা : ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনের মাত্রার ভারসাম্যের অভাবে মাসিকের ব্যথা হচ্ছে ধরে নিয়ে হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কোন ধরনের ব্যথা হচ্ছে নির্ণয় করে কনজেস্টিভ ডিসমেনোরিয়াতে হরমোন দিলে কাজ হতে পারে। তবে সব সময় হরমোন চিকিৎসায় কাজ হয় না। ঠিক ওষুধ খুঁজে পাওয়ার আগে অনেকবার ওষুধ বদলাতে হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ইস্ট্রোজেন-প্রজেস্টেরনের মিশ্র গর্ভনিরোধক বড়িই সব চেয়ে কাজের। তবে হরমোন চিকিৎসা পুরোপুরি নিরাপদ নয়। চিকিৎসা আরম্ভ করার আগে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে ভাল করে আলোচনা করে নেওয়া উচিত।
- শল্য চিকিৎসা : ওষুধ দিয়ে চিকিৎসায় ফল পাওয়া না গেলে অনেক সময় D & C (dilatation and curettage) অপারেশন করা হয়। ডায়েলেটর যন্ত্র দিয়ে জরায়ুর মুখটা বড় করে নিয়ে সরু চামচের মতো একটা যন্ত্র দিয়ে জরায়ুর ভেতরের আবরণী হাল্কা করে চেঁছে নেওয়া হয়। হাল্কা অজ্ঞান করে এই অপারেশন করা হয়, রোগী সেদিনই বাড়ি যেতে পারেন। আবরণী চেঁছে নিয়ে অণুবীক্ষণের নিচে দেখা হয় কোনও অস্বাভাবিক কোষ আছে কি না—পলিপ বা এন্ডোমেট্রাইটিস পাওয়া যেতে পারে। D & C করলেই মাসিকের ব্যথা কমবে এমনটা নাও হতে পারে।

এন্ডোমেট্রিয়োসিস সন্দেহ করলে ল্যাপারোস্কোপি করে দেখে নেওয়া যায়। খুব কম ক্ষেত্রে, যখন কোনও চিকিৎসাতেই কাজ হচ্ছে না আর ব্যথা এত বেশি যে জীবন দুর্বিসহ তখন হিস্টেরেক্টমি বা জরায়ু বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত খুব ভেবে চিন্তেই নেওয়া উচিত।

লেখক পরিচিতি : ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস। শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসার জন্য গড়ে ওঠা এক ক্লিনিকের পূর্ণ সময়ের চিকিৎসক।

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেনোপজ

মেনোপজ। চিরকালের মতো ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া। সে নিয়ে চালু আছে অনেক ভুল ধারণা, অনেক আতঙ্কও। সেগুলো প্রায় সবই ভিত্তিহীন - কিন্তু এই সময়ে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখার প্রয়োজন আছে—লিখছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জী।**

মিসেস্ দত্তগুপ্ত একটা গার্লস স্কুলের প্রিন্সিপাল। ছাত্রীরা তো বটেই সহ-শিক্ষিকারাও এত ঠাণ্ডা মাথায় এবং সহানুভূতিশীল মানুষ দেখেননি। কিন্তু কিছু দিন যাবৎ উনি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে এসেছেন। মেজাজটাও কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। যখন-তখন চেঁচামেচি করছেন। সকলেই ম্যাডামের পরিবর্তিত রূপ দেখে চিন্তিত। শেষমেষ এক দিন একজন সিনিয়র টিচার বলছেন, ওঁর মেনোপজ হয়েছে। এটা নারী শরীরে একটা স্বাভাবিক পরিবর্তন। সকলেরই হয়।

মেনোপজ কী এবং কেন হয়?

মেনোপজ শব্দের অর্থ শেষ ঋতুস্রাব। প্রাকৃতিক নিয়মেই মেয়েদের মাসিক ঋতুচক্র একটা বয়সের পর সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এর মূল কারণ হল শরীরে ইস্ট্রোজেন (Estrogen) ও প্রজেস্টেরন (Progesterone) নামক দুই হরমোনের অভাব। এই দুই নারী হরমোনের প্রভাবেই স্বাভাবিক ঋতুস্রাবহয়। তবে এ ঘটনা হঠাৎ একদিন ঘটে যায় না। শরীরে হরমোনগুলোর মাত্রা দীর্ঘ সময় ধরে কমতে থাকে। আবার, কোন্ মহিলার কখন মেনোপজ হবে এটাও অনুমান করা অসম্ভব। সাধারণ ভাবে দেখা গেছে, অধিকাংশ মহিলার মেনোপজ হয় ৫০-৫১ বছর বয়সে। কারও কারও একটু বেশি বয়সে এ ঘটনা ঘটে। তবে পরিসংখ্যানগত ভাবে দেখা যায় শতকরা ৮০ ভাগ মহিলার মেনোপজ হয়ে যায় ৫৪ (চুয়ান্ন) বছর বয়সের মধ্যে।

কী ভাবে বুঝবেন?

কোনও মধ্যবয়সী মহিলার অন্তত পক্ষে এক বছর ঋতুস্রাব না হলে তাঁর মেনোপজ হয়েছে ধরে নেওয়া হয়। এখানে অবশ্যই ব্যতিক্রমগুলো মনে রাখতে হবে। যেমন ধরুন, গর্ভাবস্থা বা স্তন্যদান (Lactation) ইত্যাদি। মেনোপজ ঘটার কয়েক বছর আগে থেকেই মাসিক অনিয়মিত হতে পারে। অনেকে এই সময় নানা উপসর্গের কথা বলেন যেমন মুখচোখ আচমকা গরম লাগা ও লাল হয়ে ওঠা, রাত্রে ঘাম হওয়া ও মেজাজমর্জির গোলযোগ হত ইত্যাদি। অনেক সময় চিকিৎসকরা বিভিন্ন হরমোন পরীক্ষা করে জানার চেষ্টা করেন কারও মেনোপজ হয়েছে কি না।

> মেনোপজ রোগ নয়। তাই একে কয়েকটা উপসর্গের মধ্যে বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়।

উপসর্গ :

মেনোপজ কোনও রোগ নয়। তাই একে কয়েকটা উপসর্গের বন্ধনীতে বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়। প্রত্যেক নারীই স্বতন্ত্র এবং তাঁর অভিজ্ঞতা অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে, এটাই স্বাভাবিক। সাধারণ ভাবে যে সমস্ত উপসর্গ দেখা যায় সেগুলো হল : হট ফ্লাশ, রাত্রে ঘামা, নিদ্রাল্পতা, বুক ধড়ফড়, গাঁটে ব্যথা, মাথাব্যথা ইত্যাদি। উপসর্গের তালিকা সহজেই আরও অনেক লম্বা করা যায়। তাই বলে এই তালিকার এক বা একাধিক সমস্যা কোনও মহিলার মধ্যে দেখা গেলেই ধরে নেবেন না তাঁর মেনোপজ হয়েছে। এই সিদ্ধান্তটা চিকিৎসকের ওপরই ছেড়ে দেওয়া ভাল।

মেনোপজের ধ্রুপদী উপসর্গ (Classic Symptom) বলতে যাকে বোঝানো হয় সেই হট্ ফ্লাশ নিয়ে এবার দু'এক কথা বলা যাক। ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ মহিলা এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হন। এটাকে একটা রক্তনালী ও উত্তেজক স্নায়ু ঘটিত উপসর্গ (vasomo-

tor symptom) ও বলা যেতে পারে। এই হট্ ফ্লাশ এক এক বারে সাধারণত তিন থেকে পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়। হট্ ফ্লাশের পেছনে শারীরিক কারণগুলো ও পুরো পদ্ধতিটা তখনও আমরা জানি না। শরীরে বিভিন্ন হরমোনের মাত্রা পরিবর্তনের জন্যই মস্তিষ্কে তাপমাত্রা নিয়ামক কেন্দ্রে কিছু গড়বড় হয় বলে ধরে নেওয়া হয়। সাধারণভাবে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ম মেনে রোজ ওঠানামা করে। সর্ব নিম্ন তাপমাত্রা থাকে ভোর তিনটের সময় এবং সর্বাধিক তাপমাত্রা থাকে সন্ধেবেলার শুরুর দিকে। এই তাপমাত্রা ওঠানামা আমাদের অগোচরে থেকে যায়। কিন্তু মধ্যবয়সী মহিলাদের শরীরে কিছু হরমোনের অভাবে এই তাপমাত্রা ওঠানামার প্রভাব বেশ কষ্টদায়ক হতে পারে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি আজীবন থেকে যায় না। বছর দু'য়েকের মধ্যে তাঁদের শরীর আবার নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে শিখে যায়।

কম বয়সে (প্রিম্যাচিওর) মেনোপজ :

চল্লিশ বছর বয়সের আগে মাসিক ঋতুচক্র সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে গেলে তাকে প্রিম্যাচিওর মেনোপজ বলা হয়। এই ব্যাপারটা ডাক্তার কোনও মহিলাকে বলতে একেবারে ভেঙে পড়তে পারেন— বিশেষ করে যাঁর বাচ্চাকাচ্চা নেই বা আরও বাচ্চা চাইছেন। তেমন মহিলারা। অনেক সময় মহিলারা বিশ্বাসই করতে পারেন না বা এই অবস্থা মেনে নিতে চান না। তাই দীর্ঘ দিন মাসিক বন্ধ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুযোগ থাকলে এই অবস্থায় বন্ধ্যাত্ব সমস্যার সমাধানও করতে পারেন প্রজন্ম বিশেজ্ঞরা।

> যাঁরা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে থাকেন এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করেন তাঁরা মেনোপজজনিত সমস্যাগুলোর সঙ্গে বেশি ভাল ভাবে মানিয়ে নেন।

পেরিমেনোপজ: মেনোপজের উপসর্গ সমূহ শুরু হওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া অবধি সময়কে পেরিমেনোপজ বলা হয়। শরীরে ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন ইত্যাদি বিভিন্ন হরমোনের ওঠানামা চলতে থাকে এই সময়। ফলে অনিয়মিত হলেও ঋতুস্রাব ঘটতে থাকে। ডাক্তারি পরিভাষায় 'পেরিমেনোপজ' পরিস্থিতিকে 'ক্লাইম্যাকটারিক' (Climacteric) ও বলা হয়।

মেনোপজের পরেও যোনিপথে রক্তপাত
(Post Menopausal Bleeding)

মেনোপজের পরে যদি কারও ঋতুস্রাবের মতো রক্তপাত হয় তবে ডাক্তারি পরামর্শ অবশ্যই নেওয়া উচিত। ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে এই রক্তপাত খুব সাধারণ কারণে হয়। কিন্তু বাকি ১০ শতাংশের ক্ষেত্রে সমস্যাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কারও কারও এটা জরায়ু - ক্যানসারের প্রথম লক্ষণও হতে পারে। এ ধরনের কোনও সমস্যা হলে অতি দ্রুত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তিনি হয়তো একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি ও জরায়ুর ভিতরের স্তরের (Endometrium) সামান্য কোষকলা (Tissue) নিয়ে বায়োপসি করাতে বলতে পারেন। যদি সেই বায়োপসিতে ক্যানসার ধরা পড়ে তা হলেও ঘাবড়ে যাওয়ার বিশেষ কারণ নেই। কারণ জরায়ুর ভিতরস্তরের ক্যানসার (Endometrial Cancer) চিকিৎসার ভাল সাড়া দেয়; বিশেষত যদি প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে।

মেনোপজ-জনিত সমস্যার প্রতিকার :

মেনোপজের অসংখ্য উপসর্গ। কারও কারও ক্ষেত্রে সে সব উপসর্গ জীবনে বেশ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বলি, জীবন যাপনের সামগ্রিক মান কমে গেছে। তা হলে এর প্রতিকার কী? সকলেরই কি মেনোপজ হলেই ওষুধ খাওয়া উচিত?

একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে, হট ফ্লাশ, রাতে ঘাম জাতীয় ভ্যাসোমোটর উপসর্গ (vasomotor symptoms) কিন্তু দু'তিন বছরের মধ্যে নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়। তবে এই সমস্ত উপসর্গ যদি ভীষণ রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে, তা হলে কিছু চিকিৎসার কথা ভাবা যেতে পারে। চিকিৎসা মানে প্রথমেই কিন্তু আমি ওষুধপত্রের কথা বলছি না। সর্ব প্রথম মন দেওয়া উচিত খাবার, ব্যায়াম এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনে।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, যাঁরা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে থাকেন এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করেন তাঁরা মেনোপজজনিত সমস্যাগুলোর সঙ্গে বেশি ভালভাবে মানিয়ে নেন। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা এই লেখার আমার উদ্দেশ্য নয়। তাও সংক্ষেপে বলতে পারি, সারাদিনে পাঁচ পোর্শন (Portions) ফল বা সবজি খাওয়া উচিত। 'Portion' বলতে বোঝায় একটা গোটা আপেল, নাসপাতি ইত্যাদি অথবা এক বাটি সবজি। তেল, ঘি জাতীয় খাবার যত বর্জন করা যায় তত মঙ্গল। এর সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে, যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ও মিনারেলস খাওয়া হচ্ছে কি না? মিনারেলস্ এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ক্যালসিয়াম। দুধ, দুগ্ধ জাতীয়' খাদ্য (Diary Products) এবং শাক সবজিতে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে, একথা প্রায় সকলেই জানেন। যদি কেউ যথেষ্ট পরিমাণে এসব খাবার না খান, তাদের জন্য দরকার ওষুধের মতো করে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম। বাজারে নানা রকমের ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। তার মধ্যে থেকে কোনটা বা কতটা আপনার প্রয়োজন, সেই সিদ্ধান্তটা চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

এখন প্রশ্ন হল, ক্যালসিয়ামের ওপর এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কী? আমাদের শরীরে যে সমস্ত হাড় রয়েছে, তার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হল এই খনিজ পদার্থ। মেনোপজের পর শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের অভাবজনিত কারণে মেয়েদের হাড়গুলো পল্‌কা / দুর্বল হতে শুরু করে। এই সমস্যাকে বলা হয় অস্টিওপোরোসিস (Ostesporosis)। খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকলে এই সমস্যা অনেকটাই আটকানো করা যায়। নিয়মিত শরীরচর্চা করলেও হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। যদি কারও ধূমপান বা মদ্যপানে অভ্যাস থাকে তাঁদের উচিত সে সমস্ত নেশা পরিত্যাগ করা।

অথ HRT কথা

মেনোপজ শব্দটা উচ্চারণ করলেই যে ওষুধগুলোর কথা অনেকের মনে আসে তাদের সংক্ষেপে বলা হয় এইচআরটি (HRT) বা Hormone Replacement Therapy। কথাটার মানে হল, শরীরে যে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন কমে আসার ফলে মেনোপজ হয় সেই ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন জাতীয় হরমোন যথাযথ মাত্রায় ও ওষুধ হিসেবে শরীরে ঢোকানো। বেশ কয়েক বছর ধরে এদের মেনোপজের মুশকিল আসন বা Cure All বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ আবার এই সমস্ত কৃত্রিম হরমোন প্রতিস্থাপনকে" Elixir to youth"

বা যৌবনে ফিরে যাওয়ার অমৃতসুধা / রাজপথ হিসাবে দেখাতে চেয়েঠেন। এবার দেখে, এই সমস্ত HRT তে কী কী হরমোন থাকে, তাদের গুণাগুণ কী এবং কী ভাবে তাদের ব্যবহার করতে হয়। প্রথমেই বলে নিই, এই সমস্ত চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়।

HRT-তে স্বল্পমাত্রায় শুধু ইস্ট্রোজেন বা ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরোন দুটো হরমোনই থাকতে পারে। এই সমস্ত ওষুধ বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায় — যেমন ট্যাবলেট, লাগানোর জেল / ক্রিম, যোনিপথে প্রবেশ করানোর Pessary, এবং প্রজেস্টেরন দুটো হরমোনই থাকতে পারে। এই সমস্ত ওষুধ বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায় - যেমন ট্যাবলেট, লাগানোর জেল / ক্রিম, যোনিপথে প্রবেশ করানোর Pessary এবং ইমপ্ল্যান্ট ইত্যাদি। এদের গুণাগুণ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের পরস্পরবিরোধী মতামত পাওয়া যায়। বড় বড় ট্রায়াল যেমন Women's Health Initiative (WHI) in 2002 এবং Million Women Study (MWS) in 2003 ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে— আমাদের সংশয়-এর মাত্রা আরও রয়েছে। যাইহোক ২০১৩ সালে British Menoppause Society-এর তরফে একগুচ্ছ অভিজ্ঞ চিকিৎসক এযাবৎ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণ একত্রিত করে কিছু নির্দেশিকা (Recommendations) আমাদের দিয়েছেন। সেই নির্দেশিকা থেকেই কিছু তথ্য সংক্ষেপে আপনাদের কাছে হাজির করব।

হট্ ফ্লাশ, রাত্রে ঘাম ইত্যাদি উপসর্গ প্রতিকারের আড়ালে লুকিয়ে আছে এই সমস্ত বিরল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

এইচ আর টি শুরু করার অন্যতম প্রধান কারণ হল হট্ ফ্লাশ, রাত্রে ঘাম ইত্যাদি vasomotar symtomy নিয়ন্ত্রণ করা। এই উদ্দেশ্যে এইচ আর টি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকরী বলেই প্রমাণিত, কী মাত্রায় এবং কতদিন এইচ আর টি ব্যবহার করতে হবে তা ঠিক করা হয় সমস্যার গভীরতা এবং ব্যক্তিবিশেষের পরিস্থিতি বিচার করে। মানসিক অবসাদ অথবা মেজাজটা বিগড়ে যাওয়া (mood disturbance) এর ক্ষেত্রেও এইচ আর টি ভাল কাজ করে স্বল্প দিনের জন্য। যদি এই সমস্ত মানসিক উপসর্গ অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশ পায় তা হলে অবশ্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নে০ওয়া উচিত।

এত গেলো স্বল্পমেয়াদি সুবিধার কথা। এবার আসি দীর্ঘমেয়াদী উপকারে। হাড়ের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং ভঙ্গুরতা (Osteoporosis) প্রতিরোধ করতে এইচ আর টি যথেষ্ট কার্যকরী। তবে এই সুবিধা ততদিনই স্থায়ী হয়, যতদিন এইচ আর টি ব্যবহার করা হয়। তাই বলে কি এইচ আর টি আজীবন ব্যবহার করবেন? সে কথায় পরে আসছি।

হৃদরোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এইচ আর টি-র প্রভাব নিয়ে আমাদের সংশয় এখনও পরিস্কার হয়নি। নব্বই-এর দশকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এইচ আর টি চালু করার পর হৃদরোগের সংখ্যা বলার মতো কমে গেছে - এমন ভাবা হয়েছিল। তারপর WHI (2002) Study-তে দেখা গেল এইচ আর টি ব্যবহারের ফলে প্রথম বছরে সামান্য হলে হৃদরোগের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আবার তৎপরবর্তী একটা সমীক্ষায় ডেনমার্ক থেকে প্রকাশিত) দেখা গেল এ ব্যাপারে লাভের পরিমাণ অনেক বেশি, যদি মেনোপজের পর দশ বছরের মধ্যে এইচ আর টি শুরু করা যায়।

এবার আসি এইচ আর টি-র কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা সম্ভাব্য ক্ষতির কথায়। WHI এবং MWS দুটি সমীক্ষাতেই দেখা গিয়েছিল এইচ আর টি করলে স্তন ক্যানসারের সংখ্যা সামান্য বাড়ছে। সহজ করে বলতে গেলে, ধরুন ৫০ বছর বয়সী ১০০০ জন মহিলার মধ্যে বছরে ১০ জনের এমনিতেই স্তনের ক্যানসার হবে। পাঁচ বছর এইচ আর টি ব্যবহার করার পর এই সংখ্যাটা হতে পারে ৫১। অর্থাৎ এইচ আরটি জনিত কারণে হাজারে একজনের স্তন ক্যানসার হল।

ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের ব্যাপারেও প্রকাশিত তথ্য বেশ ঘোলাটে। তবে WHI-এর মতো বড় সমীক্ষাতে এ ধরনের ক্যানসার বাড়ার কোনও প্রবণতা দেখা যায়নি।

অপারেশন করে জরায়ু বাদ গেলে অন্য কথা, কিন্তু যাদের তা হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে শুধু ইস্ট্রোজেন হরমোন দিলে জরায়ুর ভিতরের স্তরের (Endometrium) ক্যানসার বেড়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে চক্রাকারে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন দুটো হরমোনই দেওয়া উচিত।

এবার আসি আর একটা বহু আলোচিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথায়। এইচ আর টি ব্যবহারে Venous Thrombo Embolism (VTE) বা শিরায় রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। মুখের খাবার এইচ আর টি এই ধরনের ঝুঁকি দুই থেকে চারগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে, বিশেষত প্রথম বছরে। এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যেতে পারে যদি কারও আগে VTE হয়ে থাকে, বা VTE-র পারিবারিক ইতিহাস থেকে থাকে বা কারও ওজন প্রচন্ড বেশি হয়। যদি কাউকে 'হাই-রিস্ক' বলে মনে হয়, চিকিৎসকেরা তাঁদের জন্য এইচ আর টি মুখে না খাইয়ে ত্বকের মধ্যে দিয়ে দেওয়া (Transdermal route) পছন্দ করতে পারেন। মনে রাখতে হবে হট্ ফ্লাশ, রাত্রে ঘাম ইত্যাদি উপসর্গ প্রতিকারের আড়ালে লুকিয়ে আছে এই সমস্ত বিরল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এই সব অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে তবেই এইচ আর টি ব্যবহার করা উচিত।

শেষের কথা :

মেনোপজ কোনও রোগ নয়, মেয়েদের জীবনে একটা বিশেষ সময়। অধিকাংশ মহিলাই জীবনের এই পরিবর্তনের মধ্যে প্রবেশ করেন বিশেষ কোনও কষ্ট ছাড়াই। স্বল্প সংখ্যক মহিলার ক্ষেত্রে মেনোপজ-এর উপসর্গ বেশ কষ্টদায়ক হতে পারে। এটা তাদের কোনও দোষ নয়। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত শরীরচর্চা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় কোনও সমস্যা দেখা যায় না। অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছুজনের জন্য এইচ আর টি জাতীয় ওষুধের দরকার হতে পারে। এই সমস্ত ওষুধের সুফলের সংখ্যাই বেশি। তবে সম্ভাব্য কুফলগুলো সম্পর্কে আপনাদের অবহিত থাকতে হবে যদিও ভয়ানক কোনও সমস্যার সম্ভাবনা ভীষণ কম।

সুতরাং মেনোপজ আসন্ন বা এসে গেছে বলে হা-হুতাশ করবেন না। মনে রাখবেন মেনোপজ আসার পর আরও কয়েকটা দশক আপনাকে বাঁচতে হবে। অতএব সুস্থ থাকুন। আনন্দে বাঁচুন।

লেখক পরিচিতি : ডা. কাঞ্চন মুখার্জি, এমবিবিএস, এফ আর সিওজি, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

চি ঠি প ত্র

'*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*' পত্রিকার জুন-জুলাই' ১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা।

সম্পাদকীয়র প্রথম ছত্রে রবীন্দ্রনাথের কথা বলা আছে। যার উৎস হিসাবে উল্লিখিত আছে 'রাশিয়ার চিঠি'। এই সূত্রটা অসম্পূর্ণ। সব পাঠকের কাছে হয়তো বিষয়ের যোগসূত্র নিরূপণ করা সম্ভব হবে না।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়ে মস্কো থেকে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কয়েকটা চিঠি লিখেছিলেন। সেই সব চিঠির সংকলন নিয়েই রাশিয়ার চিঠি। রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে তাঁর প্রথম চিঠিটা লিখেছিলেন ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।

সম্পাদকীয়তে প্রথমেই উল্লিখিত ছত্রটা অতিসংক্ষেপিত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন '' ... চিরকাল মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হওয়ার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে— জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধা সব কিছুর থেকে তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।''

সম্পাদকীয়তে উল্লিখিত অংশ পড়ে 'বঞ্চিত কারা' বোঝা যায় না। মানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কারা বঞ্চিত, বিষয়টা বোঝাতে চিঠির প্রথম অংশটা থাকা উচিত ছিল বলেই মনে হয়।

সম্পাদকীয়র প্রথম ছত্রের শেষে আবার কিছুটা অংশ আছে। সেটাও অসম্পূর্ণ। লেখা আছে — 'এখানকার স্বাস্থ্যবিধির ব্যবস্থা ... তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমকে যেতে হয়।'

কিন্তু আলোচ্য পত্রের মধ্য অংশে বিষয়টা আছে এই ভাবে — 'আমার আমেরিকান সঙ্গী ডাক্তার হ্যারি টিম্বর্স এখানকার স্বাস্থ্য বিধানের ('স্বাস্থ্যবিধি' নয়) ব্যবস্থা আলোচনা করেছে— তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে ('চমকে যেতে হয়' নয়)।'

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকার প্রকাশিত ১৭টা সংখ্যা আমার সংগ্রহে আছে। স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক এই রকম পত্রিকা এই মুহূর্তে আর কোনও আছে কি না আমার জানা নেই। প্রতিটা সংখ্যাই সংগ্রহযোগ্য। বিষয়ের বৈচিত্র প্রশংসনীয়। পূর্বতন কোনও একটা সংখ্যায় প্রকাশিত ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত'র একটা ছোট গল্পে মোহনবাগান মাঠ সংলগ্ন 'র‍্যামপার্ট' নামক স্থান থেকে খেলা দেখা নিয়ে তির্যক মন্তব্যের বিরোধিতা করে আমি আপনাদের পত্রিকা দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। সেই চিঠি আপনাদের হাতে পৌঁছেছে কি না জানি না। যদি পৌঁছে থাকে তাহলে হয়তো চিঠির বিষয়বস্তুর সঙ্গে আপনারা একমত হননি। তবে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার বা প্রতিক্রিয়া কোনওটাই আমি পাইনি। যদিও আমি মানি যে, পত্রিকা প্রসঙ্গে সব চিঠিকেই গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একজন পত্রলেখকের কাছে পত্রিকা দফতরের প্রতিক্রিয়া জানার একটা কৌতূহল থেকেই যায়।

যাই হোক আবার চিঠি লিখছি। আগের চিঠির পরিণতি হবে ধরে নিয়েই আমার মতামত জানালাম।

অনুরোধ একটাই যে ভবিষ্যতে অন্য কোনও লেখকের কথা উত্থাপন করলে তার যথাযথ সূত্রটা সঠিকভাবে রাখার চেষ্টা করবেন। এতে পাঠককূলের কাছে কোনও প্রকার বিভ্রান্তি ঘটার সুযোগ থাকবে না।

ধন্যবাদান্তে -

সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী

কলকাতা।

সম্পাদকীয় সংযোজন :

শ্রী সীতাংশুকুমার ভাদুড়ীর আগের চিঠি আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে পৌঁছেছিল। সবসময় চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার বা প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব হয় না, সেটা আমাদের একটা অক্ষমতা— পত্রলেখক নিজগুণে মার্জনা করলে বাধিত হব। আর সেই চিঠি ছিল এক ছোট গল্পের এক রসিকতার ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত না হওয়া। কোনও ভুল তথ্য সরবরাহ বা কোনও মতাদর্শগত বিরোধ তাতে ছিল না। সেজন্য আমরা সেই চিঠির স্থান দিতে পারিনি।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬